মাহবুব আহমেদ

ঠিকানা যখন ওয়াশিংটন

ঠিকানা যখন ওয়াশিংটন

মাহবুব আহমেদ

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং
১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
পোষ্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ।

ফ্যাক্স: (৮৮ ০২) ৯৫৬৫৪৪৩
E-mail: upl@bangla.net

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

© ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদ: সমর মজুমদার

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র: গোলাম রাব্বানী

ISBN 984 05 0182 8

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০। টাইপসেটিং: এম.এন.এস কম্পিউটার প্রিন্টার্স, ধানমন্ডি, ঢাকা। ডিজাইনার: বাবুল চন্দ্র ধর। মুদ্রাকর: ইলোরা আর্ট পাবলিসিটি, ৬৩৫ উত্তর শাজাহানপুর, ঢাকা।

THIKANA JAKHAN WASHINGTON by Mahbub Ahmed, Published in June 1997, by The University Press Limited, Red Crescent Building, 114 Motijheel C/A, Dhaka 1000, Bangladesh.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার মেয়ে অন্তিকা-কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি	৯
নিউইয়র্কের কয়েকটি দিন	২৩
ওয়াশিংটনে জীবন শুরু	২৯
ওয়াশিংটন ডিসি'র অনেক স্মৃতি	৪১
মুভিং ফায়ার ইন ওকলাহোমা: দি ট্রেইল অব টিয়ারস্?	৫৯
পেনসিলভানিয়ার আমিশ ভিলেজ: যুক্তরাষ্ট্রের শোকেজ?	৬৫
নি'অরলিন্স: ফরাসী সংস্কৃতির একটু ছোঁয়া	৭৩
ফ্লোরিডার এপকট সেন্টার: ভবিষ্যত পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ	৭৯
ইতিহাস বার বার ফিরে আসে ফিলাডেলফিয়ায়	৮৫
বোস্টন: আধুনিক মার্কিনী সভ্যতার উন্মেষস্থল	৯৩
মেরিল্যাণ্ড: আমেরিকা ইন মিনিয়েচার?	৯৯
মিনেসোটায়: মিলন মেলায় বিদায়ী সিম্ফোনী	১০৫
শেষবিকেলে আবার দেখা	১১১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি

শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদে টম্পকিন কাউন্টি এয়ারপোর্টকে মনে হচ্ছিল যেন সোনালী আর সবুজের সমুদ্রে ভাসমান একটি শুভ্র নভোযান। প্যারিসের শার্ল দ্য গল এবং নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমান বন্দর হয়ে মাত্র ইথাকায় এসেছি। ও দু'টো যদি সাগর হয় তবে টম্পকিন যেন গাঁয়ের এক পদ্মপুকুর। ঘাসের কার্পেটের ওপর এক চিলতে ছাইরাঙা রানওয়ে। ছোট কয়েকটি আকাশযান তার উপর বিশ্রাম নিচ্ছে। এক পাশে শ্বেতশুভ্র একটি ভবন। চারদিকে হরেক রঙের ফুল দিয়ে সাজানো। একটি শান্ত, নিস্তরঙ্গ, গ্রামীণ পরিবেশ। গাছের পাতার ওপর সোনালী সূর্যের আভা সবুজ সোনালীতে এক অপূর্ব দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। ঢাকার ইউএসআইএস-এর অলিভিয়া হিলটনের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে যেন হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিমুজিন ড্রাইভার আধ ঘণ্টার আঁকাবাকা পথ পেরিয়ে নির্ধারিত কাসকাডিলা ডর্মের সামনে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও। ততোক্ষণে সূর্যের আভা অনেকটা কমতে শুরু করেছে। কাসকাডিলার নীলাভ কাঁচের গেটের সামনে আমি একাকী দাঁড়িয়ে। হাতে চাবি না থাকলে গেট খুলে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা নেই। আসলে এখানে আমার পৌঁছানোর কথা ছিলো গতকাল। বিমান বাংলাদেশ আমাকে ঠিক সময়েই প্যারিসের অর্লিতে নামিয়ে দিয়েছিল। প্যারিসের শার্ল দ্য গলে চেক-ইনও করেছিলাম যথাসময়ে। কিন্তু কপালে যদি দুঃখ থাকে তা খণ্ডাই কিভাবে? টিডব্লিউএ বিমান কোম্পানীর দক্ষ কর্মকর্তারা দফায় দফায় সময় বাড়িয়ে লাউঞ্জে বসিয়ে রাখলো ছয় ঘন্টা। ছয় ঘণ্টা বিলম্বের সংবাদটা যদি তারা একবারেই জানিয়ে দেয় তবে আর ওখানে হা করে শুধুমাত্র আকাশ দেখে সময়গুলো পার করতে হয় না। লাউঞ্জের বাইরে বের হয়ে আরেকবার না হয় মন ভরে প্যারিস সুন্দরীদের দেখে নেয়া যেত। তা আর হলো কোথায়? নিউইয়র্ক পৌঁছেও একই অবস্থা। জেএফকে-র বহির্নোঙ্গরেই ডিসি-১০টি দাঁড়িয়ে থাকলো প্রায় ঘন্টা খানেক। তার ওপর কনভেয়ার বেল্টে স্যুটকেসটি না পেয়ে ব্যাগেজ ক্লেইম কাউন্টারে দৌড়াদৌড়ি। চেক আউট করে যখন বাইরে বের হলাম তখন রাত প্রায় ন'টা। চার/পাঁচ ঘণ্টা আগেই টিডব্লিউএ-র ছোট্ট আকাশযানটি আমাকে আটলান্টিকের ওপর রেখে

www.pathagar.com

ইথাকায় পৌঁছে গেছে। বাধ্য হয়েই ছয় ঘণ্টার তাল সামলাতে আরো আঠারো ঘণ্টা অপব্যয় করে আমাকে ছুটির দিনে এখানে এসে পৌঁছুতে হলো। যাহোক, কোনো জনমানবের সাড়া না পেলেও হলের গেটে আমার জন্যে একটা মেসেজ পেলাম। পৌঁছে যেন গেটের সামনে রেডিও সিস্টেমের মাধ্যমে ডর্মের কেয়ারটেকারকে মেসেজ পাঠাই। ওখানে লেখা ব্যবহারবিধি রপ্ত করে বোতাম টিপতে টিপতে প্রায় ক্লান্ত হওয়ার অবস্থা, কোনো প্রতি-উত্তর নেই। কোনো হোটেলে গিয়ে উঠার কথা ভাবছি। হঠাৎ কাঁচের গেটের ভেতর থেকে তিনজন ছাত্র বের হয়ে এলো।

"চেষ্টা করে লাভ নেই। ওটা কাজ করে না। আমি কিছুক্ষণ পূর্বেও চেষ্টা করেছি কথা বলার জন্যে।" ওদের মধ্যে থেকে একজন দক্ষিণ এশীয় উচ্চারণে বলল। আলাপ জমতে সময় লাগল না। ওরা জাপানী তিন বন্ধু; চিসাকী, মুরাতা, হিরাতা। ওরা জানালো আজ ছুটির দিন, ডর্মের সব অফিস বন্ধ। আগামীকাল সকালের আগে রুমে ঢোকা যাবে না। কি আর করা যায়। গত রাত কাটিয়েছি নিউ ইয়র্কের জামাইকার হোটেল ট্রাভেল লজে টিডব্লিউএ কোম্পানীর পয়সায়। আজকের রাতটির জন্যে না হয় নিজের গাঁটে হাত পড়লোই। হোটেলে যাবার জন্যে ব্যাগটা মাত্র তুলেছি। ওরা তিনজন হো হা করে কি যেন আলাপ করল নিজেদের ভাষায়।

"তোমার যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে তবে আমার কক্ষে রাতটা কাটাতে পারো। আমার রুমে দু'টো বেড রয়েছে।" মুরাতার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কোন কারণ ছিলো না। ওর কক্ষে ব্যাগটি রেখেই ওদের আহ্বানে ডিনারে যেতে হলো। কাসকাডিলার পার্শ্বে কলেজ স্ট্রীটের একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয় যখন ডিনারের জন্যে ঢুকলাম তখনও সূর্যের আলো ডোবেনি। সন্ধ্যা না হতেই ডিনার, এ আবার কেমন রীতি? সংকোচের কারণে ওদের কিছু বলতেও পারছি না। খেতে খেতে এক সময় রেস্তোরাঁর দেয়াল ঘড়িতে দেখলাম সময় সাড়ে আটটা । ঘড়ি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মুরাতার দিকে তাকালাম। মাথা নুইয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে মুরাতা বুঝাতে চেষ্টা করছে —

"এখানে সামার। তাই সন্ধ্যা নামে ন'টার সময়। তোমার ডিনার টাইম সম্ভবত ঠিকই আছে।"

একটা রাত মুরাতার রুমে কাটিয়েছিলাম। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। আমার কোনরূপ অসুবিধা হয় কিনা তা ভেবে বোধ হয় ও নিজেও সে রাতে ঘুমোতে পারেনি। একবার কি একটা নেয়ার জন্যে যেন টেবিলের কাছে গেল। কিন্তু এমন আস্তে আস্তে পা ফেলল যে আমি অবাক। ওর ভাবনা শেষে আবার আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় কিনা। মুরাতাই পরে আমাকে ভেন্ডিং মেশিন, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, ইত্যাদি সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার শিখিয়েছিল। ওর মত অমায়িক এবং ভদ্র মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।

পরদিন থেকেই ক্লাশ শুরু হয়ে গেল। শুধু ক্লাশ তো নয় যেন ব্যাটন হাতে রিলে রেস। একটার পর একটা কিছু লেগেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্লাশ শুরু হবে স্প্রিং

www.pathagar.com

সিমেস্টারের মাধ্যমে। আমি এখানে এসেছি সামার সেশন-এর একটি বিশেষ কোর্স করার জন্যে। ছয় সপ্তাহের কোর্সটি করেই আমাকে চলে যেতে হবে ওয়াশিংটন ডিসি-তে। স্প্রিং সিমেস্টার থেকে আমি হব ওখানকার দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটির নিয়মিত ছাত্র। এদেশে সামার মানেই–ছুটি, আনন্দ-উচ্ছলতা, আর ঘুরে বেড়ানো। তাই অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সামারে কোন সিমেস্টার নেই, আছে বিশেষ ধরনের সেশন্ বা কোর্স। সামারের কোর্সগুলোর মধ্যেও থাকে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। অংশগ্রহণকারীদের চলনে-বলনে পোশাক-পরিচ্ছদেও অনুভব করা যায় একটা উচ্ছলতার অনুভূতি।

ইথাকা নামের ছোট্ট অথচ অপূর্ব শহরটির এক প্রান্তে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়। নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে পাহাড়, জলরাশি আর সবুজ প্রান্তরে ঘেরা একটি স্নিগ্ধ শহর ইথাকা। নিউইয়র্ক শহর থেকে ইথাকার সড়ক-দূরত্ব প্রায় পাঁচ ঘণ্টার। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা এজরা কর্নেল। যুক্তরাষ্ট্রের IVY League-ভুক্ত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম এই কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে উৎকীর্ণ চিরন্তন বাণী "I would found an institution where any person can find instruction in any study".

এর মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে লাইব্রেরীর সংখ্যাই ষোল। প্রায় প্রতিটি লাইব্রেরীই আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অপেক্ষা আয়তনে কয়েক গুণ বড়। কর্ণেলের লাইব্রেরীগুলো ওয়াশিংটন ডিসি-তে কংগ্রেস লাইব্রেরীর সঙ্গে সংযুক্ত, অর্থাৎ প্রয়োজনে ঐ লাইব্রেরীর সঙ্গে বই কিংবা দলিল-পত্রাদি আদান-প্রদান হয়ে থাকে। ক্যাম্পাসটি সব দিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজস্ব পাঁচতারা হোটেল থেকে শুরু করে পুলিশ বাহিনী সবই আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। পাঁচতারা হোটেলটি পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোটেল ম্যানেজমেন্ট বিভাগ। একই সঙ্গে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই রয়েছে বুক-স্টোর, গ্রোসারী-স্টোরসহ অনেক ক্যাফেটেরিয়া। ভেন্ডিং মেশিনগুলোতেও স্বল্প মূল্যে প্রচুর দুধসহ নানারূপ খাবার পাওয়া যায়।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, তথা সমগ্র ইথাকা অঞ্চলটিকেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলা চলে। এতো বৈচিত্র্যময় হরেক রকম রঙের সহাবস্থান আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রীষ্মের পোশাক পরে যখন ক্লাশের দিকে ছুটতো সে চলার উচ্ছলতার মধ্যে যেন একটা ছন্দের মূর্চ্ছনা বাজতে থাকতো। কোনো কোনো দিনের বৃষ্টি-মুখর দুপুরের পর বিকেলের এক পশলা রোদকে মনে হত যেন স্বর্গীয় দীপ্তি। পড়ন্ত রোদে আর্টস স্কোয়াড-এর ক্লক টাওয়ার এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাগ পোস্টের ওপর দিয়ে দিগন্তে যখন চোখ মেলে তাকাতাম তখন দূরের গাঢ় সবুজ পাহাড়, তার নীচে গাঢ় নীল জলরাশি, লেকের এপারের কচি সবুজে মিলে যে কি এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি

www.pathagar.com

হত তা ফুটিয়ে তোলার ভাষা আমার জানা নেই। ইমপ্রেশনিস্ট কোন চিত্রশিল্পীই হয়তো-বা আলো-ছায়ার এ অপরূপ খেলা তার রং আর তুলির মাধ্যমে ক্যানভাসে তুলে আনতে পারবে। একটু পেছন দিকে আছে খরস্রোতা বি বি লেক। লেকের সেতুটির ওপর দাঁড়ালে আমার বার বার মনে পড়তো গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নলগোলা নদীটির কথা। শুনেছি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রচনা করেছিলেন বেশ কয়েকটি কবিতা।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল কাসকাডিলা নামের একটি ডর্মে। পঁচিশ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে ছাত্র এবং ছাত্রীরা একই সঙ্গে এই ডর্মে দিন এবং রাত কাটায়। একই কক্ষে দু'জন বসবাস করতে পারে। তবে বিপরীত লিঙ্গের দু'জনকে এক কক্ষে কর্তৃপক্ষ নিজ উদ্যোগে বরাদ্দ করে বলে মনে হয় না। নিজেরা থাকতে চাইলে আপত্তি করে কিনা জানা নেই। তবে ছাত্র কিম্বা ছাত্রীদের জন্যে পৃথক কোনো কক্ষ চিহ্নিত করা নেই। পাশের কক্ষটি কোনো নীলনয়না স্বর্ণকেশীর হবে, নাকি স্বগোত্রীয় কোন সতীর্থের হবে তা নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই। তবে টয়লেট চত্বরে কোনো সুন্দরীর দেখা পাওয়া ভার। কারণ এ বিষয়ে পুরো দেশ জুড়েই মানব-মানবীর জন্যে রয়েছে একেবারে পৃথক ব্যবস্থা। কাসকাডিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর-প্রান্তে অবস্থিত। এর দক্ষিণ পার্শ্বে রয়েছে ছোট্ট একটি বন আর বনের মধ্যে সদা প্রবহমান একটি জলপ্রপাত (Cascade)। ঐ কাসকেড থেকেই হলটির নাম হয়েছে কাসকাডিলা। এখানে সময়গুলো আমার ভালোই কেটেছে। আমার কক্ষটি তিন তলায়, দক্ষিণ প্রান্তে একেবারে যেন জলপ্রপাতের ওপর। জানালাটা খুলে দিলেই জল গড়িয়ে পড়ার ঝম ঝম শব্দ। কখনো মনে হত যেন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ধ্বনি, কখনো মনে হত ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ঐ কবিতার ছন্দের কথা *নূপুর পায়ে ঝুমুর তালে চলছে দুলি ...।* যেন কোনো এক পাহাড়ী মেয়ে নৃত্যের তালে তালে চলছে অনন্ত কাল ধরে, যে চলার কোন শুরু নেই, শেষ নেই।

ক্লাশ শুরু হত সকাল আটটায়। বেশীর ভাগ সকালেই ভেন্ডিং মেশিনে পয়সা ফেলে পছন্দ মতো খাবার বেছে নিয়ে ক্লাশে ছুটতে হত। অনেককেই রাস্তায় হাঁটা অবস্থায় নাস্তা সারতে দেখেছি। ক্লাশে বসে ডুনাট, মাফিন-এর সঙ্গে কফি বা সফ্‌ট ড্রিঙ্ক দিয়ে নাস্তা খাওয়ার দৃশ্য হরহামেশাই চোখে পড়তো। কোনো ক্লাশে কোনো শিক্ষক নিজেই হয়তো বা কফির গ্লাস হাতে নিয়ে ক্লাশ রুমে ঢুকলেন। এ সব দৃশ্য আমাদের দেশে কল্পনা করা যায়? বেশীর ভাগ ক্লাশই হত ইউরিস, ওহলিন, মরিল ইত্যাদি সব হলে। কাসকাডিলা হতে বের হয়ে ছোট একটি ব্রিজ পার হতে হত। তারপর ক্লক টাওয়ারকে বাঁয়ে রেখে ডান দিকে মোড় নিয়ে নিত্যদিনের হাঁটা, কোনোদিন দশ মিনিট কোনোদিন আবার পঁচিশ মিনিট। হাঁটার পথে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীতো থাকতোই। তাছাড়া সাক্ষাৎ মিলতো অসংখ্য কাঠবেড়ালীর। ঘাসের কচি পাতা অথবা ওর মধ্যে পোকামাকড় খুঁজতে ওরা কখন যে

www.pathagar.com

একেবারে পায়ের উপর এসে পড়তো। শুধু কর্নেলে নয় এদেশের অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই এ প্রাণীটির সহজ বিচরণ লক্ষ্য করেছি। শিক্ষার সঙ্গে কি এ প্রাণীটির কোনো সম্পর্ক আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দালানের সামনেই সুন্দর করে সাজানো ফুলের বাগান। হরেক রঙের নাম-না-জানা ফুল দিয়ে সাজানো। গ্রীষ্মকালে এতো ফুল! ঠিক আমাদের দেশের উল্টো। শীতকালে সমগ্র ইথাকা থাকে সাদা বরফে আচ্ছাদিত। গ্রীষ্মে যেমন ইথাকার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে সবুজ আর হরেক রঙের ফুলের সমন্বয়ে, ঠিক তেমনি শীতের ইথাকার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় শুভ্রতার মধ্য দিয়ে। যা বলছিলাম, কোনো-কোনো দালানের সামনে আসলে চলার গতি আপনা-আপনিই শ্লথ হয়ে যেতো ফুলের বাহার দেখে। নাম-না-জানা ঐ ফুলের হাসি দেখার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গেলেতো ছন্দের আশ্রয়ই নিতে হবে।

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম
'কি তোমার নাম?'
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ বুয়েন্স-আয়ার্সে এসে ফুল দেখেছিলেন—না হলে ভাব প্রকাশের এমন ভাষা কোথায় পেতাম!

ইথাকা নামটির উৎপত্তির ইতিহাস আমার জানা নেই। হয়তো বা এটাও কোনো এক ইন্ডিয়ান শব্দ। কারণ এই এলাকায় এক সময় সম্ভবত Sinnehock গোষ্ঠীর ইন্ডিয়ানদের স্থায়ী আবাস ছিলো। তাই অনেক স্থান, পাহাড়, জলাভূমি এমনকি পার্কের নামকরণের মধ্যেও ওদের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এদেশের ইতিহাস বিশেষত ঐতিহ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কলম্বাসের সময়কে আরম্ভ না ধরে নেটিভ ইন্ডিয়ানদের ঐতিহ্য-কৃষ্টিকে ঐতিহ্যের অংশ বলে স্বীকার করে নিয়ে এ দেশের ঐতিহ্যকে আবিস্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে আজকাল। ওয়াশিংটন ডিসি-র আমেরিকান নেচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম পরিদর্শনকালে বার বার আমার এ কথাই মনে হয়েছে। বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উপকরণ, ব্যবহৃত তৈজস-পত্র, নৃতগীতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, চিত্রকর্মসমূহ, ইত্যাদিকে এমন গুরুত্ব সহকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে তা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। মানুষ ও জীবজন্তুর স্ট্যাচু, বাড়ীঘর, পোষাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে ঐ সময়কে যেন হুবহু ধরে রাখা হয়েছে ঐ যাদুঘরটিতে। যা বলছিলাম, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনই এক উইক-এন্ডে গিয়েছিলাম Gayuga Nature Centre-এ। গ্যায়োগা শব্দটিও ইণ্ডিয়ান শব্দ। গহীন অরণ্যের ভেতর অভিযান এবং একটি স্থানে রাত্রি যাপন। কতো রকম শারীরিক কসরত যে শেখালো—

www.pathagar.com

জাহাজ ডুবিতে আত্মরক্ষা থেকে শুরু করে গাছ থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়া পর্যন্ত। এসব শারীরিক কসরতে আমার কোনোকালে তেমন একটা আগ্রহ ছিলো না। তবে গহীন অরণ্যের ভেতরে রাত্রি যাপন সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যেভাবে আঁধারের রূপ বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে ইথাকার অরণ্যের আঁধারের রূপের মধ্যে কি খুব একটা পার্থক্য আছে? গ্যায়োগার গহীন অরণ্যের মধ্যে, চারদিকের সবুজ আর অস্বাভাবিক নীরবতার মধ্যে কেন জানি আমার মনে পড়ে গেল বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথা। কিছুক্ষণের এই একাকিত্বের মধ্যে এই নীরবতার মধ্যেও ভালো লাগার অনেক কিছু আছে যা খুঁজে নিতে হয়। একবার মনে হলো অরণ্যের এই সবুজ গভীরতায় জীবনের কঠিন ধূসর পথের ছবিগুলো কি হারিয়ে ফেলা যায় না? হয়তো যায়। যায় বলেই এখানে এসে মানুষ বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে। হয়ে ওঠে ভাবপ্রবণ, স্বপ্নদর্শী।

Cayuga Lake এ নৌভ্রমণ এবং Taughannock পার্কের পিকনিকে না গেলে বোধ হয় ভুলই করতাম। ছোট্ট রাজহাঁসের মতো একটি জাহাজে করে গাঢ় নীল জলরাশি ভেঙে জাহাজটি এক সময় আসল Taughannock পার্কের ঘাটে। Cayuga এবং Taughannock এই শব্দ দু'টিও আদি ইণ্ডিয়ান ভাষা থেকে নেওয়া। চল্লিশটি দেশের প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর হৈ-চৈ আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে শান্ত নীরব পার্কটি যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো মুহূর্তের মধ্যে। পিকনিকে খাবার সময় মেক্সিকোর এক ছাত্র, চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে, নামটি ঠিক মনে করতে পারছি না, পাউরুটির পেছনের পোড়া অংশ দেখিয়ে বললো—

: জানো, রুটির এই অংশটিকে আমাদের দেশে কি বলে?

: কি ?

: মাদার-ইন-ল, শাশুড়ী, অর্থাৎ যাকে কেউ পছন্দ করে না।

ওর কথা শুনে চারিদিকে হাসির ফোয়ারা। বুঝলাম, কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে যা সার্বজনীন। দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। পরে জেনেছি আমাদের দেশের পুত্র-বধুরা যেমন অনেক ক্ষেত্রেই শাশুড়ী দ্বারা অত্যাচারিতা হয়ে থাকে, আমেরিকায় স্ত্রীর মায়ের খবরদারিতে অনেক জামাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।

পার্কের কিছু দূরেই রয়েছে ইথাকা ফল্‌স। যা নাকি নায়েগ্রা ফল্‌স অপেক্ষাও উচ্চতর। লোভ সামলাতে পারলাম না। বনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। প্রায় ঘন্টা খানেক হাঁটার পর পৌছানো গেল। গাইড শেলী গড় গড় করে ফল্‌সটির আয়তন, উচ্চতা, আবিস্কারের ইতিহাস বলতে লাগলো। আমি শুধু ঘাড় পেছন দিকে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর উচ্চতা অনুভব করার চেষ্টা করলাম। উচ্চতায় বিশাল হলেও জলধারা সেই তুলনায় ক্ষীণ। ওখানে দাঁড়িয়ে আমার বারবার মনে পড়তে লাগলো আমার স্ত্রী বাবলীকে সঙ্গে নিয়ে কি কষ্ট করেই না আমাদের হিমছড়ির জলধারাটি দেখতে গিয়ে হতাশ হয়েছিলাম। তারও বহু বছর আগে বন্ধু ও এক সময়ের সহকর্মী নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম শ্রীমঙ্গলের

www.pathagar.com

বলাসছড়ির 'ছড়ি' অর্থাৎ ঝরনা দেখতে। অথচ ইথাকায় নাকি ছোট বড় মিলিয়ে সহস্রাধিক ঝরনা রয়েছে।

একদিন সহকারী প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ন্যান্সী প্রস্তাব নিয়ে এলো নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে যাওয়ার। সকালে গিয়ে রাতে ফিরে আসা। যারা-যারা যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে বিশ ডলার চাঁদা দিয়ে নাম লেখাতে হবে। বাসের সব সিট আগেই পূরণ হয়ে যায় সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে চাঁদা দিয়ে এলাম। পরে দেখি আমার টিকেটের নম্বর এক। নির্ধারিত দিন সকাল সাড়ে ছ'টার সময় ফ্ল্যাগ পোস্ট থেকে বাস ছাড়লো। বাসে চড়ার সময় ন্যান্সী একমাত্র আমার টিকিটই ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলো। বলাতো যায় না, একমাত্র বাদামী চামড়ার লোকটি আবার বিনা-টিকেটে বাসে চড়ে বসে কিনা। ইথাকাতে রয়েছে প্রচুর Winearies। সেখানকার পানীয় পান রসিকজনের নিকট বিশেষ প্রিয়। Winearies-এর পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার সামনের সিটে বসা জাপানী সহপাঠিনী কুমির সেকি উল্লাস' ধ্বনি। ওর জীবনের একমাত্র সখ ওয়াইনের স্বাদ নিয়ে গবেষণা করা। মানুষের শখ কতো বিচিত্র হতে পারে। ক্যায়োগা লেক, ওয়াটার-লু পার হয়ে রচেস্টার এসে আধ ঘন্টার বিরতি। রচেস্টার শহরের এক প্রান্তে হাইওয়ে-এর ওপর অবস্থিত ফাস্ট ফুড শপ এর পাশে একটি ফলক। রাজ্য-কর্তৃপক্ষ স্থাপন করেছে।

> Seneca Indian often camped along the lower Genesee river where Rochester enentually developed. During the 17th century. Frence soldiers and missionaries visited the area. In 1803 Nathaniel Rochester, William Fitzhugle and Charles Carrol of Maryland purchased the 100 acre trac of the upper falls. Permanent settlement began there in 1863.
>
> — *State of N.Y. 1963*

একশ একর জমি ক্রয় করা হয়েছিলো। বাকী হাজার হাজার একর জমিতে সভ্য ইউরোপীয় বসতি কিভাবে গড়ে উঠলো সে সম্পর্কে রাজ্য-কর্তৃপক্ষ একেবারেই নীরব।

রচেস্টারে কিছু সময় কাটিয়ে বাফালো হয়ে যখন নায়েগ্রা পৌঁছলাম তখন সময় দশটা পেরিয়ে গেছে। ফল্‌স এর কাছে যাওয়ার পথেই রয়েছে নায়েগ্রা রিজার্ভেশন; যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরানো রাষ্ট্রীয় পার্ক। ১৫ জুলাই ১৭৮৫তে স্থাপিত। বাস থামতেই সকলে হুড়োহুড়ি করে ফল্‌স কমপ্লেক্সে গিয়ে ঢুকলো। আমি প্রথমে ঢুকলাম পার্কটিতে। যা দেখতে এসেছি তা একটু পরেই দেখতে চাইলাম। সংবাদপত্র পাঠ করার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি অনেক সময় পরেই পাঠ করি। হেডিং গুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে অপ্রয়োজনীয় সংবাদই হয়তোবা আগে পড়ে ফেললাম। ছোট্ট অথচ সুন্দর করে সাজানো

www.pathagar.com

পার্কটির একটি স্ট্যাচু এবং একটি মনুমেন্ট আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করলো। স্ট্যাচুটি একজন নেটিভ ইন্ডিয়ান নেতার। স্ট্যাচুটির বেদীতে লেখা রয়েছে—

Chief Clinton Rikard

RO-WA-DA-GAH-RA-DEH

Loud-Voice

Tusca Rora

Beaver Clan

May 19, 1882- June 16, 1971

Founder of Indian Defence League of America

— Niagra Town Authority.

ক্লিনটন রিকার্ড কবে এবং কি কারণে ইন্ডিয়ান ডিফেন্স লীগ অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আমি আর খুঁজে দেখতে যাইনি। তবে তাঁর জন্মের পূর্বেই কয়েক শতাব্দী ধরে যে ইন্ডিয়ানদের টিকে থাকার জন্যে অবিরাম যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে সে কথা সভ্য জগতের কে না জানে? যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের Trail of tears নামে খ্যাত পর্বটি পড়লে যে কোনো সভ্য মানুষের বিবেকে দংশন না হয়ে পারে না।

ক্লিনটন রিকার্ডের স্ট্যাচুর খুব কাছেই একটি ছোট্ট মনুমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে, তাঁদের স্মরণে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমেরিকার জন্যে জীবন-দান করেছেন। ঐ মনুমেন্টটিতে বিভিন্ন ইউরোপীয় নাম রয়েছে, যাঁদের জীবনদানের সময় ১৮৬০-৬৫। তাঁরা কি কারণে এবং কিভাবে আমেরিকার জন্যে জীবনদান করলেন সে বিষয়ে কিছু লেখা হয়নি। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে কি? তাই যদি হয় তবে স্ট্যাচু আর মনুমেন্টের কি আশ্চর্যজনক সহাবস্থান। কলিঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে গৌতমবুদ্ধের-শান্তির বাণী-উৎকীর্ণ শিলালিপি স্থাপন করে সুচতুর অশোক যেমন ঐ যুদ্ধের স্মৃতিকে ঢেকে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন তার সঙ্গে কি এর কোনো অমিল আছে?

পার্কটিতে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে শান্ত মনে দাঁড়ালাম জল প্রপাতের প্রাঙ্গণে। একেবারে জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়লো আগ্রার তাজমহল দেখার এক টুকরো স্মৃতি। তাজের সামনে নিয়ে এসে গাইড নীলুফার বলেছিলেন, এখন তুমি তাজমহলকে নিজ চোখে দেখতে পারো, ছুঁতে পারো নিজ হাতে। কিন্তু মমতাজের জন্যে শাহজাহানের ভালোবাসাকে বুঝতে হলে তোমাকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও প্রেমিক হতে হবে। একমাত্র তোমার হৃদয় দিয়েই ওর ভালোবাসাকে পরিমাপের চেষ্টা করে দেখতে পারো। আর নায়েগ্রার সামনে দাঁড়িয়েও আমার মনে হলো একে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় সত্য, কিন্তু অনুভব করতে হবে হৃদয় দিয়ে। নায়ে-গারা ইন্ডিয়ান শব্দ দু'টি থেকে নায়েগ্রা নামের উৎপত্তি। শব্দ দু'টির অর্থ

www.pathagar.com

নাকি দেবতার গর্জন। ছোট বেলায় ভূগোল বইতে পড়ে নায়েগ্রার বিশালত্ব নিয়ে যে কল্পনা করেছিলাম সে-কল্পনাকে কিন্তু বাস্তবতা হার মানাতে পারলো না প্রথমে। আমার কল্পনায় ছিলো সুউচ্চ পাহাড় থেকে জলরাশি প্রবল গর্জনে গড়িয়ে পড়বে নীচে। কারণ জলপ্রপাতের সঙ্গে পাহাড়ের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে বলে আমার ধারণা ছিলো। কিন্তু যে স্থানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেটা একটা বিশাল মালভূমি, যাকে সমভূমি বলে মনে হচ্ছে। আর এই মালভূমি থেকে জলরাশি প্রবল গর্জনে ছুটে চলছে নীচের নদীর বুকে। নদীর এপারে যুক্তরাষ্ট্র আর ওপারে কানাডা, মাঝখানে রেইনবো ব্রীজ। উভয় তীর থেকেই লোকজন জাহাজে করে নদীতে নামছে। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পাসপোর্ট দেখিয়ে সাময়িক ভিসা নিয়ে কানাডায় গিয়ে জাহাজে উঠলো। আমার কালচে সবুজ রঙের পাসপোর্টটি আমার কাছে জীবনের মত মূল্যবান। ওদের কাছে এর মূল্য যাচাই করতে যাবার ইচ্ছে হলো না। তাই আমি এপার থেকেই নদীতে নামতে গেলাম। এলিভেটর অর্থাৎ লিফ্ট দিয়ে যে কতটুকু নীচে নিয়ে এলো তা বলা মুশকিল। পিটার এবং ইরিনকে সঙ্গে নিয়ে Maid of the Mist নামের জাহাজে উঠলাম। গায়ে নীল রেইনকোট। ওপারের যাত্রীদের রেইনকোটের রঙ হলুদ। রেইনকোর্টের রঙ দিয়ে জাহাজের মালিকানা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করেছে কোম্পানীগুলো। জাহাজ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছি। অনুভব করলাম জাহাজ দুলছে প্রবল বেগে। কে কার গায়ে ঢলে পড়ছে, তাল রাখা দায়। এক সময় নিজেকে আবিস্কার করলাম জাহাজের ডেকে, চারিদেকে গুড়ি-গুড়ি জলের দেয়াল-ঘেরা অবস্থায়। জাহাজের নামকরণের কি অপূর্ব সার্থকতা। অদূরে দাঁড়ানো ইরিন চীৎকার করে কি যেন বললো আমাকে। কিন্তু নায়েগ্রার সুতীব্র চীৎকারের কাছে ইরিনের চীৎকার হারিয়ে গেল। জলরাশির ঐ প্রবল গর্জনকে দেবতার গর্জনের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। এখানেই হয়তো নায়েগ্রা নামকরণের সার্থকতা।

জাহাজ থেকে নদীর তীর দিয়ে পায়ে হেঁটে ভিন্নভাবে দেখতে চেষ্টা করলাম নায়েগ্রাকে। ওপরে উঠে আবার হাঁটলাম এদিক-সেদিক। কখনো একা, কখনো সঙ্গে অন্য কেউ। সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম। শেষ বিকেলে আবার যখন অবজারভেশন টাওয়ারে এসে দাঁড়ালাম তখন কেন জানি না একে আরো ভালো লাগতে লাগলো। বার বার মনে হতে লাগলো স্ত্রী ও কন্যার কথা। ওদেরকে নিয়ে যদি অনন্তকাল ধরে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যেতো। যে খ্রিষ্টান ধর্মযাজক একে আবিস্কার করে অবাক বিস্ময়ে এর দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তার নাম জপ করছিলেন তাঁর কথাও মনে হলো। যে-সব অসীম সাহসী অভিযাত্রী ভেলায় চড়ে ওপর থেকে নীচে নামতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রাণ দিয়েছে, মনে হলো তাদের জীবন দানের মধ্যেও একটা সার্থকতা আছে। এক সময় লক্ষ্য করলাম বিয়ের পোশাক-পরা এক জোড়া বর-বধূ অদূরে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ধাবমান জলের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের জীবনে যে-স্রোতের ভেলা আজকে ওরা ভাসালো তার গন্তব্য কোথায় কেইবা জানে!

www.pathagar.com

এতো কিছুর পরও যখন ফিরে আসছি তখন দেবতার গর্জনের পরিবর্তে আমার কানে বাজতে থাকলো আমার নিজ কক্ষ থেকে শোনা কাসকাডিলার নিত্যদিনের ঝম-ঝম-ঝম সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা... হৃদয়ে ভাসতে লাগলো শত সমস্যায় ভারাক্রান্ত একখণ্ড সবুজ প্রান্তর, নাম যার বাংলাদেশ।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ আনন্দ মুখর একটি দিন কাটিয়েছি রবার্ট ট্রিম্যান পার্কে। ইথাকা শহর থেকে খানিক দূরে অবস্থিত অপূর্ব সুন্দর একটি পার্ক। এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বশেষ গেটটুগেদার। দুপুরের পর হৈ-চৈ ছেড়ে একাকী হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম বেশ খানিকটা দূরে। একটা বেঞ্চের মধ্যে বসে আছি। আমার চারিদিকে ঘন সবুজ অরণ্য। নিথর নিস্তব্ধ। অনতিদূরে একটি যুগল পরস্পর প্রেম বিনিময় করছে। আর কোনো প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। তিন দিক দিয়ে বয়ে চলছে তিনটি পানির ধারা, কুল-কুল ধ্বনিকে সেতারের মূর্চ্ছনার মতো মনে হচ্ছে। চারিদিকের এই নীরবতার মধ্যে, সবুজের মধ্যে, সঙ্গীতের ধ্বনি আর মূর্চ্ছনার মধ্যে আমার অন্তরে তখন ঘুরপাক খেয়ে মরছে বাবলী আর দু'বছরেরও কম বয়সী মেয়ে অন্তিকার স্মৃতি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি অন্তিকার বয়সী একটি মেয়ে আমার সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে পেছনে পেছনে ওর বাবাও হাঁটছে ওকে ধরার জন্যে। কী স্বর্গীয় দৃশ্য! আমার স্মৃতিতে তখন অন্তিকা সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের মাঠ দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আর আমি ওকে ধরার জন্যে ওর পেছন পেছন ছুটছি। একটা পানির কলের সামনে দিয়ে যাবার সময় বোধ হয় মেয়েটির জুতোয় কাদা লেগে গেল। ওর বাবা ওকে কোলে তুলে পার্কের কলের জলে ওর জুতোর কাদা ধুইয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। মেয়েটি হাত দিয়ে পানি নাড়ছে, বাবা হাত সরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। মনে রাখার মতো একটি দৃশ্য। এখানে এত সবুজ আর প্রকৃতির মধ্যেই তা এমনভাবে সাজানো যে চোখ জুড়িয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশ বাংলায় জন্মে রূপসী বাংলা লিখেছিলেন; এ দেশে জন্মালে কি লিখতেন কে জানে? পার্কগুলোও এমনভাবে সাজানো যে কোনো খুঁত ধরার উপায় নেই। পার্কের মাঝে কিছুটা দূরে-দূরেই পানির কল। খাবার গরম করার জন্যে আধুনিক চুল্লি, বসার বেঞ্চ, বাথরুম, রেস্ট রুম, সবই আছে। এগুলো না থাকলেই বা কি হতো। প্রকৃতি এখানে এত উদার হাতে বিলিয়েছে যে, আধুনিক কোনো উপকরণের ছোঁয়া না থাকলেও ক্ষতি নেই।

অন্তিকার কথা মনে পড়ায় খুব খারাপ লাগছিলো। কিছু দূরে একটা ছোট্ট জল-প্রপাতের পাশে ঘাসের ওপর শুয়েছিলাম।

: আমেদ! তোমার কি মন খারাপ?

সহপাঠিনী ভেনিজুয়েলার মেয়ে সুলাই-এর ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। অত্যন্ত প্রাণবন্ত উচ্ছল একটি হিসপ্যানিক মেয়ে। বিভিন্ন পার্টিতে আমাকে নাচ শেখানোর চেষ্টা করে ইতোমধ্যে সে ব্যর্থ শিক্ষকের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তবে স্প্যানিশ সংগীতে সুরের প্রতি অনেকেরই দুর্বলতা সৃষ্টিতে ও ব্যর্থ হয়নি। ওর ক্যাসেটে শোনা বিভিন্ন স্প্যানিশ সংগীত সত্যিকার অর্থে আমাকেও আকর্ষণ করেছিলো।

www.pathagar.com

: হ্যাঁ, আমার মেয়ের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু তুমি কি করে বুঝলে?

: আজকে আমার মনের অবস্থাও তোমার মতো। একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তোমার কি সময় হবে? আমার কিছু কথা শুনবে?

: সময় অফুরন্ত। তাছাড়া তোমার মত সুন্দরীর সঙ্গে গল্প করে কাটানো এটাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার।

: দুষ্টমি করোনা প্লিজ। মনযোগ দিয়ে আমার সমস্যাটা শোনো। তারপর একটা পরামর্শ দাও।

: তুমি বলো! বাঙ্গালী আর কিছু না পারলেও বিনে পয়সায় উপদেশ দিতে কখনো কার্পণ্য করেনি।

: আবার ফাজলামো শুরু করলে?

: আমি দুঃখিত। তুমি বলো। আমি শুনছি।

: একটি আমেরিকান ছেলে আমাকে প্রপোজ করছে বেশ কিছুদিন ধরে। ইথাকায়-ই থাকে, কর্ণেলে পড়ে, ওর বাবা মা থাকেন ওয়াশিংটন ডিসি-তে। বেশ ধনীপরিবারের একমাত্র ছেলে। ছেলেটিকে আমারও ভালো লাগে। তবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, কি করবো?

: এটা একটা সমস্যা হলো! ছেলেটি তোমাকে প্রপোজ করছে। তোমারও ভালো লাগে ছেলেটিকে। ধনী পরিবারের ছেলে। তবে অসুবিধা কোথায়? গেঁথে ফেলো।

: আমেদ, তুমি ভালো করেই জানো আমার এখানকার কোর্স প্রায় শেষ পর্যায়ে। কয়েকদিন পরই আমার দেশে ফিরে যাবার কথা। তাছাড়া বিরাট বড়লোকের একমাত্র ছেলের জন্যে কি ওর পরিবার আমার মতো দরিদ্র দেশের একটি মেয়েকে বৌ হিসেবে মেনে নেবে?

: তুমি দেখছি আমাদের দেশের মেয়েদের মতো কথা বলছো। শ্বশুর-শাশুড়ীর মেনে-নেয়া-না-নেয়া কি এদেশে কোনো বিষয় হলো? যাকে তুমি বিয়ে করছো সে মেনে নিলেই হলো।

: তুমি জানো না, এদেশে কতো রক্ষণশীল পরিবার রয়েছে। তাছাড়া ও আমার সঙ্গে এখনই ভেনিজুয়েলায় চলে যেতে চাচ্ছে।

: তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। তুমি ওকে নিয়ে ভেনিজুয়েলায় চলে যাও। ওখানে গিয়ে সংসার শুরু করো।

: তাই বা কি করে যাবো ভাবছি। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

: এটা নিয়ে এতো ভাবনার কি আছে?

: তুমি জানো না, আমাদের পরিবারের কথা। স্পেনের একটি ছোট্ট দ্বীপে আমার বাপ-দাদার বাড়ি। ছোটবেলায় পিতৃহীন বাবা মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে দেশ ছাড়ে। ভাগ্যের অন্বেষণে গিয়ে পৌঁছায় ভেনিজুয়েলায়। এখানে এসে ব্যবসা শুরু করে, বড়লোক

www.pathagar.com

হয়। একজন হিসপ্যানিক মেয়েকে বিয়ে করে এখানে সেট্‌ল্ হয়। আমরা পাঁচ ভাই-বোন সেই সংসারের ফসল। বর্তমানে বাবার বয়স প্রায় ষাট। এতোদিন পরেও সে নিজের দেশকে ভুলতে পারেনি এখন সে স্পেনে নিজের দেশটিতে ফিরে যেতে চাচ্ছে। আমার অন্যান্য ভাই-বোনেরা সবাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমিই কনিষ্ঠ সন্তান। বাবা চাচ্ছেন আমিও তার সঙ্গে সেই দ্বীপে যাই। বাবা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্য। মা যেহেতু তার নিজ দেশ ছেড়ে যাবে না, তাই আমি বাবাকে একা যেতে দিতে পারবো না। তার সঙ্গে আমাকেও স্পেনে যেতে হবে।

: বেশতো ভালো কথা। ঐ ছেলেটি যদি আমেরিকা ছেড়ে তোমার সঙ্গে ভেনিজুয়েলা যেতে চায়, তবে নিশ্চয়ই স্পেনেও যেতে চাইবে।

: তা হয়তো চাইবে। কিন্তু তুমি চিন্তা করো আমার বাবার কথা। সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসর পরেও সে তার নিজ জন্মভূমিকে ভুলতে পারেনি। শত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও আমি ভেনিজুয়েলাকে ভুলতে পারি না। ডিলন কি করে তার নিজ দেশকে ভুলে আমাকে নিয়ে পড়ে থাকবে স্পেনের কোনো এক অখ্যাত দ্বীপে? এক সময় ওর ভালোবাসায় চিড় ধরবে। হয়তোবা মন খারাপ করবে। আমি এখন ওকে যত বড়ো ভাবছি আমার ভাবনাটা এক সময় মিথ্যে হয়ে যাবে। আমার কাছে ডিলন ছোট্ট হয়ে যাবে, এটা হয়তো আমি সহ্য করতে পারবো না। তাই ওর প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারছি না।

এযে দেখছি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য! যে যুক্তিতে বাংলাদেশের লাবণ্য শত ভালোবেসেও অমিতকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো, সেই একই ভাবনায় ভেনিজুয়েলার সুলাই ফিরিয়ে দিচ্ছে আমেরিকার ডিলনকে। আমার নিজের কোনো ঘটনা না হলে এটাকে আমার কাছে নিছক একটা গল্প বলেই মনে হতো। ঐ সব দেশের মেয়েদের এ-জাতীয় ভাবনা হয়, এরকম আগে কোনোদিন ভাবিনি। আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণাটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের মেয়েরা বহির্মুখী, স্বামী এবং সংসারের চেয়ে আনন্দ-স্ফূর্তিই এদের কাছে বড়। কিন্তু পাশ্চাত্যেও-যে ভালো মনের মেয়ে আছে, স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করছে, আমাদের দেশের মেয়েদের মতো জটিলতা ওদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি, সে কথা হয়তোবা আমরা অনেক সময়ই ভেবে দেখি না।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ক্লাশ শুরু করে দিয়েছি। কোনো একটি হলের দোতলা দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ দেখি, 'Dept. of Bengali', বাংলা বিভাগের নেম বোর্ড। কক্ষের ওপর নেমপ্লেট ঝুলানো দীপালী সুদান। স্বাভাবিকভাবেই একটু আগ্রহী হলাম পরিচিত হওয়ার জন্যে। কিন্তু ওঁকে কক্ষে না পেয়ে টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করে একদিন বাসায় ফোন করলাম। আমার স্ত্রী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রী। ও আসছে কয়েকদিন পর। তাই ভাবলাম ওর জন্যে এখানে কোনো কোর্স-এর ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এ উদ্দেশ্য নিয়েই মূলত ফোন করা। ভদ্র মহিলা ইংরেজী উচ্চারণে আমার সাথে বাংলায় কথা বললেন। ওখানকার বাংলা বিভাগে সাধারণত বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে আসতে ইচ্ছুক লোকজনদের

www.pathagar.com

প্রাথমিক বাংলা ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলায় উচ্চশিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। তবে ভদ্রমহিলা আমার একটা উপকার করলেন। বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকানা বার্নস হলের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অফিসে পাওয়া যাবে বলে তথ্য দিলেন। পরদিন আইএসও অফিসে গিয়ে চারজন বাংলাদেশীর ঠিকানা পেলাম। এভাবেই প্রথম পরিচয় হলো প্রকৌশল বিভাগের পিএইচডি-র ছাত্র লিয়াকত আলী খান, আরেক পিএইচডি-র ছাত্র বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজ, কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ড. মনোয়ার এবং সর্বশেষে ড. আওয়াল এবং ওর স্ত্রী লোরার সঙ্গে। ড. আওয়ালদাদ খান এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতা। বর্তমানে ও এবং ওর স্ত্রী দু'জনেই কর্নেলে শিক্ষকতা করছেন। বেশ কয়েকটি সন্ধ্যা কাটিয়েছি ওদের আতিথেয়তায়।

কর্নেল ছেড়ে চলে আসছি। পূর্বনির্ধারিত সকাল সাতটায় জাপানী সহপাঠী চিছাকী ও নরিও উপস্থিত। চিছাকীর গাড়িতে করে গ্রেহাউন্ড কোম্পানীর বাসষ্ট্যান্ডে এসে পৌঁছালাম। নির্ধারিত সময় পার হয়ে আরও পনের মিনিট অতিক্রান্ত। আমাকে বাসে তুলে চিছাকী ও নরিও একটু দূরে দাঁড়িয়ে। ওদেরকে বার বার বলার পরও ওরা ফিরে যাচ্ছে না। মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এ কয়েকটি দিনেই ওদের সঙ্গে মায়ার জালে জড়িয়ে পড়েছি। মিনিট পনের পর জানা গেলো বাসে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ওদের মিস্ত্রী আসছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে চিছাকী নিজেই এগিয়ে এলো। ও কর্নেলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি করছে। জাপানের টয়োটা কোম্পানীর কর্মচারী। ওর হাত লেগে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সমস্যার সমাধান। বাসের ড্রাইভার ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাস ছেড়ে দিলো। আমি চিছাকীর দিকে তাকালাম। আমাকে বিদায় জানানোর জন্যে চিছাকীর মুখমণ্ডলে যে বিষণ্নতা ছিলো তা কেটে গিয়ে ওখানে একটা তৃপ্তির হাসি। জাপানীরা বোধ হয় কাজ করে যতটা আনন্দ পায়, অন্য কিছুতেই তা পায় না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিউইয়র্কের কয়েকটি দিন

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সমাপ্ত হলো ত্রিশে জুলাই। দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি-তে স্প্রিং সিমেস্টারের ক্লাশ শুরু হবে সেপ্টেম্বর থেকে। তবে ওয়াশিংটন ডিসি-তে রিপোর্ট করতে হবে আগস্টের নয় তারিখে। হাতে বেশ কয়েকদিন সময়। এ ক'দিন কি করা যায় তাই নিয়ে ভাবছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের এককালের সহপাঠি ও বন্ধু মোখলেস টেলিফোনে বললো—'চলে আয় নিউইয়র্ক। কয়েকদিন আড্ডা মেরে তারপর রাজধানীতে যাবি।' মোখলেস অর্থাৎ মোখলেজ-উজ-জামান, স্থানীয় একটি কম্পিউটার কোম্পানীতে চাকরী করে। সকাল বেলা বের হয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যায়। আমি সারাদিন ঘুরে ঘুরে নিউইয়র্ক দেখি। ওয়াশিংটন ডিসি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, আর নিউইয়র্ক ওদের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর ম্যানহাটান দ্বীপটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আজকের নিউইয়র্ক মহানগরী। দ্বীপটিতে একসময় কোনো বসতি ছিলো না। Sinnecock গোষ্ঠীর ইন্ডিয়ানরা এখানে ভালুক, হরিণ, শৃগাল, বনমুরগী, ইত্যাদি শিকার করে বেড়াতো। ১৬২৬ সালে দ্বীপটি ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে মাত্র চব্বিশ ডলার মূল্যের রঙিন কাপড়ের বিনিময়ে কিনে নেয় ওলন্দাজরা। নামকরণ করে নিউ আমস্টারডাম। ১৬৬৪ সালে ইংরেজরা দ্বীপটি অধিকার করে নেয়। নামকরণ করে নিউইয়র্ক। বিগত তিনশ বছর ধরে গড়ে-ওঠা শহরটিকে আমি সারাদিন দেখে দেখে অবাক হই। এতো উঁচু উঁচু দালান এর আগে ছবিতে দেখেছি, নামও শুনেছি অনেকবার; কিন্তু নিজ চোখে প্রথম দেখছি। এ এক অন্য রকম অনুভূতি।

প্রথম দিনেই জাতিসংঘ ভবনে। ভবন-চত্বরে অন্যান্য অনেক পতাকার সঙ্গে আকাশে উড়ছে কালচে সবুজ আর উদীয়মান টকটকে লাল সূর্যের সমন্বয়ে তৈরী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো এর সৃষ্টির জন্যেই ত্রিশ লাখ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এর সৃষ্টির পক্ষে এবং বিপক্ষে কতোইনা তৎপরতা হয়েছে সামনের এই ভবনটিতে। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হলে নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব এবং সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছয় বার ভেটো প্রয়োগের ঘটনার স্মৃতি দৃশ্যপটে ভেসে উঠতে লাগলো। ভবনটিতে গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ,

www.pathagar.com

ইত্যাদি সকল কক্ষই ঘুরে ঘুরে দেখালো। জাতিসংঘ-চত্বরের কয়েক একর জায়গার মালিকানা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নয়। ঐ চত্বরের জন্যে রয়েছে পৃথক প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এমনকি নিউইয়র্ক পুলিশেরও ঐ ভবনে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। ঐ ভবন থেকে জাতিসংঘের বিশেষ ডাকটিকেট ব্যবহার করে বিশ্বের যে-কোনো দেশে ডাক প্রেরণ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ডাকটিকেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। বিষয়টি জানার পর বেশ মজা পেলাম। ওখানে বসে বেশ কয়েকটা ভিউকার্ড পোস্ট করলাম।

একদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে। সেখানেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছে। ১২০ তলা দালানটির ওপরে অবজারভেশন টাওয়ারে উঠে চারদিকে যখন তাকালাম তখন মনে হলো আকাশ থেকে নিউইয়র্ক দেখছি। অবজারভেশন টাওয়ারের বিশাল এলিভেটর অর্থাৎ লিফট-এ উঠে 'ওয়েলকাম' শব্দটির পাশে আরো কয়েকটি ভাষার সঙ্গে 'স্বাগতম' শব্দটি লেখা রয়েছে। এদেশের সর্বোচ্চ ভবনের স্থপতি বাঙ্গালী ফজলুর রহমান খানকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যেই কি বাংলা ভাষা এখানে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে?

পরদিন ব্রঙ্কস্ জু'তে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী দেখে দেখে ক্লান্ত প্রায়। হঠাৎ কানের কাছে বাংলা ভাষায় কথা বলার শব্দ ভেসে এলো। স্বাভাবিকভাবেই হাঁটার গতি শ্লথ করে দৃষ্টি ফেরালাম পেছন দিকে। নামফলকে লেখা দেখলাম বেঙ্গল এক্সপ্রেস মনোরেল। বেঙ্গল শব্দটিই আমকে টেনে নিয়ে গেলো কাউন্টারের দিকে। কোনো কিছু না ভেবেই টিকেট কেটে চেপে বসলাম মনোরেলে। চিড়িয়াখানার ভেতরে রেলগাড়িতে করে নির্দিষ্ট এলাকা ঘুরে দেখা। এক সময় বেঙ্গল অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে বলা হলো মাইকে। প্রাণীগুলো দেখে নেয়ার দায়িত্ব যাত্রীদের। অবাক কাণ্ড। গাইড একবারের জন্যও বাংলাদেশ কিংবা দোয়েল পাখির নামটি উচ্চারণ করলো না। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সম্পর্কে একবার কিছু একটা বললো, তবে এ প্রাণীটি যে একটি স্বাধীন দেশের জাতীয় প্রাণীর মর্যাদা পেয়েছে সেই বিষয়ে গাইড একেবারেই নীরব।

একদিন গেলাম স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে। আটলান্টিক মহাসাগরের আপার নিউইয়র্ক উপসাগরের লিবার্টি দ্বীপে অবস্থিত স্ট্যাচু অব লিবার্টি। প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে দণ্ডায়মান ১৫১ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট রমণীর স্ট্যাচুটি সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের কাছে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। ফ্রান্সের নাগরিকদের আর্থিক সহায়তায় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্ট্যাচুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। মূল ভিত্তি থেকে মশাল পর্যন্ত ৩০১ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত রয়েছে ১৫২টি ধাপ। দ্বীপের একটা নির্ধারিত স্থান থেকে স্ট্যাচুটির মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে আমার সময় লেগেছিলো তিন ঘন্টা। অথচ ব্যাটারি পার্ক এর ফেরিঘাট থেকে দ্বীপটিতে পৌঁছাতে সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র পনের মিনিট। সরু পথ বেয়ে ওপরে ওঠার সময় মনে পড়লো সুড়ঙ্গ পথে দিল্লীর জামে মসজিদের মিনারে ওঠার স্মৃতি। জামে মসজিদের সুড়ঙ্গটি আরো সরু, অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিছুটা দূরে দূরে আলো প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা আছে, ওরা বলে রশনি দানী। এখানাকার সিঁড়ি-পথ তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত। আলোর কোনো অভাব নেই।

www.pathagar.com

আধুনিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটাই তার সমাধান করেছে। ১৪২টি সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আবার নিচে নেমে দ্বীপ থেকে নিউইয়র্ক শহরটিকে ভালোভাবে দেখতে চেষ্টা করলাম। মনে হলো মহাসমুদ্রের মাঝে অখংখ্য সুউচ্চ দালান দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যাবে। স্ট্যাচুটির নিচের দিকে একটা স্থানে মার্কিন ইহুদি কবি Emma Lazarus কর্তৃক ১৮৮৩ সালে রচিত একটি কবিতা উৎকীর্ণ করা আছে। কবিতাটি আমাকে বেশ আকর্ষণ করলো। কবিতাটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ—

"Keep ancient lands, your storied
pomp! cries she
with silent lips, "Give me your
tired, your poor,
your huddled masses yearing to
breathe free,
The wretched refuse of your
teeming shore,
send these, the homeless,
tempest, tost to me
I lift my lamps beside the golden door!"

মার্কিন অভিভাষণ আইনের ক্রমাগত কড়াকড়ির বদৌলতে কবিতার মূল বাণী আজ বোধ হয় অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

স্ট্যাচু অব লিবার্টির অনতি দূরেই রয়েছে এলিস্ আইল্যান্ড। ফেরার পথে নামলাম ঐ দ্বীপে। এখানে রয়েছে ইমিগ্রান্টস মিউজিয়াম। যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন নিয়ে আসতে হলে এক সময় সকলকেই এলিস আইল্যান্ড হয়ে আসতে হতো। এখানে নাম তালিকাভূক্তিকরণ ও অন্যান্য অফিসিয়াল ফর্মালিটি পালন করার পরই মূল ভূখন্ডে ঢুকতে দেওয়া হতো। ঐ সব ইমিগ্রান্টদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে স্থাপন করা হয়েছে একটি আকর্ষণীয় জাদুঘর। জাদুঘরটির একপাশে রয়েছে এক কম্পিউটার কক্ষ। ঐ কক্ষের কম্পিউটারে নিজ বংশের ইতিহাস অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন কোনো একজন আমেরিকানের নামের শেষ অংশ Stepanek। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে ঐ Stepanek বংশের প্রথম লোকটি কবে কোন দেশ থেকে, কিভাবে এ দেশে এসেছে, ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য তিনি এখান থেকে বের করে নিতে পারবেন। অনেককেই দেখলাম নিজ নিজ বংশ পরিচয় বের করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কম্পিউটার নিয়ে। বিভিন্ন সময়ে কোন মহাদেশ থেকে কোন নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠির কতোজন লোক এদেশে ইমিগ্র্যান্ট হয়েছেন তার একটা ডিসপ্লে বোর্ড দেখলাম ঐ জাদুঘরটিতে। দ্বীপটির চারদিক জুড়ে সমুদ্র উপকূলে রয়েছে 'ওয়াল অব অনার' নামের দেয়াল। সেখানে তৎকালীন সকল

www.pathagar.com

ইমিগ্র্যান্টদের নাম উৎকীর্ণ করা আছে। ওটা দেখার সময় মনে পড়লো নয়াদিল্লীতে অবস্থিত দিল্লি গেটের কথা। ঐ গেটটিতে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বিভিন্ন সময় যারা জীবন দান করেছেন, তাদের নাম খোদাই করা রয়েছে। পরবর্তীকালে ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভেও তাদের খোদাই করা নাম দেখেছি। আমাদের দেশের জন্যে যারা জীবন দান করলেন তাদের নাম উৎকীর্ণ করে এ জাতীয় কোনো স্তম্ভ কি নির্মাণ করা যায় না? ইমিগ্র্যান্ট মিউজিয়ামের এক পাশেই রয়েছে একটি মুভি হল। সেখানে একটি তথ্যচিত্র দেখলাম ইমিগ্র্যান্টদের সেই সময়কার জীবন নিয়ে। কি অসহ্য কষ্টই না স্বীকার করতে হয়েছে বর্তমান প্রজন্মের মার্কিনীদের পূর্বপুরুষদের। Land of happiness, land of sorrow নামের ঐ চিত্রটি দেখার পর অধিকাংশ দর্শককেই চোখ মুছতে মুছতে হল থেকে বের হতে দেখলাম। অনেকেই মনে করে মার্কিনীরা স্ফূর্তিবাজ এবং সব সময় বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত। অতীতকে নিয়ে মাথা ঘামায় না মোটেও। কথাটি বোধহয় সর্বাংশে সত্য নয়। অন্ততপক্ষে ছবিটি দেখার পর অধিকাংশ দর্শকের চোখে অশ্রু দেখে আমার এ রকমই মনে হয়েছে।

একদিন আটলান্টিক সিটিতে। গ্রেহাউন্ড কোম্পানির বাসে মাত্র তিন ঘন্টার জার্নি। ভাড়া পঁচিশ ডলার। ক্যাসিনো ব্যালির সামনে নামিয়ে আবার দশ ডলার ফেরত দিলো। লাস ভেগাসের অনুকরণে আটলান্টিক উপকূলে গড়ে তোলা হয়েছে এ ক্যাসিনো নগরী। সমুদ্রের তীর ঘেঁসে সুউচ্চ সব দালান। দূর থেকে দেখেই চাকচিক্যের প্রমাণ মেলে। আমি প্রথমেই গেলাম সমুদ্র সৈকতে। রাস্তা থেকে কাঠের প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয়েছে সৈকতে যাওয়ার জন্যে। শত শত নারী-পুরুষ সৈকতের উপযোগী পোষাক পরে সমুদ্রতটে বসে আছে। এ গরমের মধ্যে কি ওরা রোদ পোহাচ্ছে? কেউ কেউ আবার নেমে পড়েছে সমুদ্রের জলে। ছোট্ট একটি বীচ। বালুগুলোও হালকা এবং ময়লাযুক্ত। আমাদের কক্সবাজারের বীচটিকে এর চেয়ে হাজারো গুণ ভালো বলে মনে হলো আমার কাছে। বিয়ের পর বাবলীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম হিমছড়িতে। সমুদ্রতট দিয়ে জীপে করে হিমছড়ি যাবার পথে যে অপূর্ব প্রাকতিক দৃশ্য, তার সঙ্গে কী এর কোনো তুলনা হয়?

বীচ থেকে বের হয়ে প্রথমে ঢুকলাম ক্যাসিনো স্যান্ডস-এ। বিরাট বিরাট হল রুমের ভেতর রঙিন আলো-আঁধারিতে জুয়া খেলছে হাজারো জুয়াড়ি। বেশিরভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। ক্যাসিনো তাজমহলের সামনে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। আগ্রার তাজমহলের স্থাপত্য রীতি ব্যবহার করে তৈরী করা হয়েছে ভবনটি। ক্যাসিনো ব্যালিতে এসে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। ডলার ভাঙিয়ে শ্লট মেশিনের সামনে যে কখন দাঁড়িয়ে গেছি। নির্ধারিত স্থান দিয়ে পয়সা ঢুকিয়ে হাতল ঘোরালেই হলো। কখনো বা মেশিনে পয়সাগুলো খেয়ে ফেলবে। জ্যাকপট মিললে ফেরত দেবে কয়েকগুণ। আমার সঞ্চয় মাত্র দশ ডলার। এক সময় পয়সা গুণে দেখি প্রায় একশ ডলার জমে গেছে। একবার ভাবলাম এবার উঠে পড়ি। আবার ভাবলাম আরেকটু খেলি। এবার হারার পালা। হারাতে হারাতে

www.pathagar.com

যখন প্রায় দশ ডলারে এসে ঠেকেছি তখন কোনোরকমে নিজেকে আটকে ফেলে বেরিয়ে এলাম ক্যাসিনো ব্যালির হলরুম থেকে।

দ্বিতীয়বার নিউইয়র্ক আসি জানুয়ারী '৯৩-এ। এবার উঠি সহকর্মী ফেরদৌস আরা বেগমের বাসায়। তাঁর স্বামী তাজুল ইসলাম জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির অফিসে প্রেস সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত। ফেরদৌস আরা আপার ৭১ কন্টিনেন্টাল এভিনিউ, কুইনস-এর বাসাটি সুন্দর এবং চমৎকার করে সাজানো। যদিও সামার-এর উচ্ছলতা হারিয়ে শীতের তীব্রতায় নিউইয়র্ক ঝিমিয়ে পড়েছে, ফেরদৌস আপা এবং তাজুল ভাইয়ের আতিথেয়তার কয়েকটি দিন ভালোই কেটেছে। এবার এসেছিলাম অফিসিয়াল প্রোগ্রামে। ইউএনও, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, সিটি হল, স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি তাবত অফিসে নানারূপ সাক্ষাৎ আর ব্রিফিং এ যখন হাঁপিয়ে উঠেছি, কিটির স্বামী ওয়ালেট শেরউইন প্রস্তাব করলেন ব্রডওয়েতে নাটক দেখার জন্যে। এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? এক কথায় সকলেই রাজি। কিটিই সব ব্যবস্থা করলো। পঞ্চাশ শতাংশ রিডাকশনে পঁয়ত্রিশ ডলার করে টিকিট কেনা হলো ব্রডওয়ের ডি প্যালেস থিয়েটার থেকে। The Will Rogers Follies নামের একটা পারফরমেন্স দেখলাম। এতো সুন্দর গ্রুপ পারফরমেন্স আগে কখনো দেখিনি। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় শতাধিক শিল্পীর পোষাক পরিবর্তন, লাইটিং এর মাধ্যমে ষ্টেজ পরিবর্তন যা আমাদের দেশে কল্পনা করা যায় না। ম্যাক ডেভিস এবং মারলা ম্যাপল্‌স এর অনবদ্য অভিনয় চিরদিন মনে রাখার মতো।

নিউইয়র্ক ছেড়ে পুনরায় ওয়াশিংটনে আসার আগের দিন। টাইম স্কোয়ার থেকে হেঁটে এম্পায়ার এষ্টেট বিল্ডিং-এ প্রাক্তন সহকর্মী জনাব শাহ আলম চৌধুরীর সাথে সাক্ষাতের জন্য তার অফিসে যাচ্ছিলাম। সাইড ওয়াক অর্থাৎ ফুটপাত দিয়ে হাঁটার সময় চোখে পড়লো একজন লোক ফুটপাথের এক কোনায় ম্যাপ, ক্যালেন্ডার ইত্যাদির দোকান সাজিয়ে বসেছে। পোষাক ও চেহারা দেখে বাঙ্গালী বলে মনে হলো। কাছে গিয়ে সোজা বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম—

: আপনি কি বাংলা বুঝেন?

: কিছু কিছু।

: কিছু কিছু কেন? আপনার কথা শুনেতো বাঙ্গালীই মনে হচ্ছে।

: ঠিকই ধরেছেন। তা আপনি দেশ থেকে কবে এসেছেন? বসেন।

ভদ্রলোক বসতে বললেন, কিন্তু কোথায় বসবো বুঝলাম না। ফুটপাতের ওপর একটা কাগজ বিছিয়ে ওর অস্থায়ী দোকান। ওখানে বসার মতো কোনো জায়গা চোখে পড়লো না। আমার সত্যিকারের পরিচয় গোপন রেখে বললাম

: বেড়াতে এসেছি কয়েকদিনের জন্যে। আবার চলে যাবো কয়েকদিন পরেই।

: যাবেন কেন? এই দেশে এসে কি কেউ চলে যায়? দেশে গিয়ে করবেনই বা কি?

www.pathagar.com

ভদ্রলোক আমার আপত্তি সত্ত্বেও একটু দূরের দোকান থেকে এক গ্লাস কফি, দুধ ও চিনি এনে দিলেন আমার হাতে।

: দেশের মানুষ। তাই সামান্য একটু আপ্যায়ন করছি। কিছু মনে করবেন না। খেলে খুশি হবো।

বাধ্য হয়ে কফিতে চুমুক দিতে হলো। কফি খেতে খেতে কথা। কয়েক লাখ টাকা খরচ করে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছেন ভদ্রলোক। নাম আবু বকর। বাড়ি মুন্সিগঞ্জে। প্রায় এক বছর হতে চললো। মনের মতো কোন কাজ পায়নি। তাই অস্থায়ী এই দোকান। কোনো রকমে চলে যাচ্ছে এই দোকান থেকে। বিদায় নেবার সময় আবু বকর সাহেব বললেন—

: আমি শিগগির দেশে ফিরে যাবো। নিজ দেশ ছেড়ে এভাবে থাকার কি কোনো মানে হয়? দেশে যদি বারো কোটি লোকের ব্যবস্থা হয়, তবে আমারও হবে। গুলশান-বনানীতে যারা বাড়ী বানিয়েছে তারা নিজ দেশে থেকে টাকা রোজগার করেই বানিয়েছে। কাউকে দেশ ছেড়ে বিদেশে আসতে হয়নি।

আমি কোনোরূপ মন্তব্য না করেই তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনে জীবন শুরু

"সব ঠাঁই মোর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে
আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।"

পাশ্চাত্যের দেশগুলো নাকি ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। অথচ আমার বেলায় সব জায়গাতেই 'লেট'। প্যারিস, নিউইয়র্ক, ইথাকা যেখান থেকে যাত্রা করতে গেছি সব জায়গাতেই বিমান অথবা বাস 'লেট'-এর খপ্পরে পড়েছি। নিউইয়র্ক ছেড়ে ওয়াশিংটন ডিসি যাচ্ছি নিউজার্সির নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে উড়োজাহাজে উঠিয়ে বসিয়ে রাখলো প্রায় চল্লিশ মিনিট। বাতাসের তীব্রতা এবং গতিবেগে নাকি কি-সব গোলমাল ধরা পড়েছে। বাধ্য হয়ে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামলাম প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরী করে। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে নির্ধারিত ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়াতেই অদূরে দণ্ডায়মান সারি থেকে হুশ করে একটা ইয়োলো ক্যাব এসে দাঁড়ালো সামনে। তাতে চেপে বসলাম। অমুক জায়গায় যাবে? ভাড়া কতো? এসব কথোপকথনের বালাই নেই এদেশে। নির্ধারিত এলাকায় যাত্রীর পছন্দমতো যে-কানো জায়গায় যেতে হবে ট্যাক্সি চালককে। ভাড়া স্থির হবে মিটার অথবা চার্ট দেখে। ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে ড্রাইভারই আলাপ জুড়ে দিলো। নানা দিক ঘুরিয়ে নানা কিছু বর্ণনা করতে করতে ইরানী ট্যাক্সি চালক অবশেষে আমাকে নামিয়ে দিলো বাথেসডার ম্যানোর-ইন-এ। আটত্রিশ ডলার ভাড়া নিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে বিদায় নেবার সময় বললো, 'মুসলিম ব্রাদার বলে তোমার কাছ থেকে দশ ডলার কম ভাড়া নিলাম।' পরে জেনেছিলাম ঐ দূরত্বের জন্যে প্রকৃত ভাড়া ছিলো বিশ থেকে পঁচিশ ডলার। ম্যানোর-ইন-এ থাকা অবস্থায়ই দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে আমার শিক্ষাজীবন শুরু হলো। পোল্যান্ডের ম্যাসিয়েস লেনসে, গ্রীসের থিওডোরা কুতরা, হাঙ্গেরীর ইরিন বারতোক, জিম্বাবুয়ের জুডিথ মশিনিয়া, ঘানার এম্মা আডিনিয়ারা-এই সব হামফ্রে ফেলোদের সাহচর্যে কয়েকটি দিন ভালোই কাটলো। একটা হোটেলেতো আর দীর্ঘ দিন থাকা যায় না।

www.pathagar.com

তাই এবার বাসা খুঁজে নিতে হবে। যার যার পছন্দ মতো কেউ কেউ বাসা খুঁজে নিলো। ক্লাশ এবং নানাবিধ প্রোগ্রামের ফাঁকে ফাঁকে শুরু হলো আমার বাসা খোঁজার সংগ্রাম। সাথে প্রোগ্রামের সহকারী কোঅর্ডিনেটর কিটি শেরউইন-এর সহযোগী মার্সেলা উইলী নামের মেয়েটি।

ওয়াশিংটন শহরে নির্ধারিত সীমিত অঙ্কে পছন্দমতো বাসা খুঁজে পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো ব্যাপার। ওয়াশিংটন ডিসি আবার চারটি অংশে বিভক্ত; উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব। একদিন হামফ্রে রুমে আমেরিকান সহপাঠিনী বিনা কি-একটা কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলো Racial Seggregation দেখার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার প্রয়োজন নেই, ওয়াশিংটন ডিসি-ই যথেষ্ট। দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে একবার গিয়েই দেখো না। তাছাড়া অপরাধ প্রবণতার কথা বিবেচনা করে হালিম ভাই, ভার্জিনিয়ার সালাউদ্দিন, বিশ্বব্যাংকের আক্তার মাহমুদ, দূতাবাসের ইমতিয়াজ-সহ অনেকেই ওয়াশিংটনের আফ্রিকান আমেরিকান-অধ্যুষিত দক্ষিণ অংশে বাসা ভাড়া না নেওয়ার জন্যে উপদেশ দিয়ে মনের মধ্যে একটু ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। তাই শুধু মাত্র উত্তর পশ্চিম অংশেই ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। বাসার ব্যাপারে আমার হরেক রকমের শর্ত। বাসা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, অন্ততপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শাট্‌ল্ বাস যায় এমন স্থানে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যাতায়াতের জন্যে থাকতে হবে বাস অথবা মেট্রো লাইনের ব্যবস্থা। ভাড়া হতে হবে কম। ওয়ান বেডরুম-এপার্টমেন্টে আমার বউ-বাচ্চাসহ থাকতে দিতে হবে। আমার শর্তের মধ্যে পড়ে এমন স্থান হিসেবে জর্জ টাউনের গ্লোভার পার্কই ছিলো সবচেয়ে উপযুক্ত এলাকা। তাই কিটির পরামর্শ মোতাবেক বাড়ী ভাড়ার বিভিন্ন উৎস, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বাড়ীর তালিকা, রাস্তার বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি ঘেঁটে কখনো বা হেঁটে হেঁটে বাসা খুঁজে ফিরছিলাম গ্লোভারপার্ক এলাকা দিয়েই। প্রথম দিনেই মার্সেলা যে-বাড়িটির সামনে আমাকে দাঁড় করালো, সেটাকে আমার মনে হলো একটা ভুতুড়ে বাড়ি। চারিদিকে বন-জঙ্গলে ভরা, আঙ্গিনাটা নোংরা, মনে হয় বহুদিন ধরে কেউ বাড়িটি ব্যবহার করেনি।

: বাড়ীটি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?

আমি কিছু বলার আগেই জুডিথ উত্তর দিলো মার্সেলার প্রশ্নের।

: না, এ বাড়ি তোমার নেয়া চলবে না। এখানে তোমার বউ-বাচ্চাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারবে না। আস্তে করে বললো, 'মেয়েটি সুন্দরী হলে কি হবে কোনোরকম রুচিবোধ নেই।'

অতএব কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে হলো না।

পরের দিন একটি এপার্টমেন্ট ভবনে গিয়ে এক বিব্রতকর অবস্থা। অফিসের কর্মচারী মেয়েটি যেমনি সুন্দরী, তেমনি আচার আচরণে উদ্ধত, যা সচরাচর এদেশে দেখা যায় না। কাকে-যে কখন কি বলে বসে। চোখ, মুখ, হাত-পা যেন এক সাথে কথা বলে। ঠিক যেন বিহারীলালের 'রূপ গর্বে ডবকা ছুড়ি ফেটে আটখানা' কবিতার

www.pathagar.com

লাইনটিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যেই ওর সৃষ্টি। দু'একটা কথা বলার পরই ওর বিব্রতকর মন্তব্য, তোমাদের বাচ্চার বয়সী আরো একটি মিশ্র বর্ণের বাচ্চা আছে সাত নম্বর এপার্টমেন্টে। কল্পনা করুন আমার অবস্থা। আমি মার্সেলার বিব্রতকর অবস্থার কথাও ভাবছি। আর ও বার বার আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছে, 'আমারই ভুল হয়েছে। ওকে প্রথমেই বলা উচিত ছিলো যে, তুমি বাসা খুঁজছো এবং আমি তোমাকে সহায়তা করছি মাত্র।' অন্য কোনো ভবনে ঢুকেই মার্সেলার প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়ালো ঐ জাতীয় প্রশ্নের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা পরিষ্কার করে দেওয়া। সে যাই, হোক ভাড়া বেশী বলে এপার্টমেন্টটি আর নেওয়া হলো না। আরেকদিন মার্সেলা নিয়ে এলো বিশাল এক এপার্টমেন্ট হাউজে। এপার্টমেন্টটি বেশ, তবে এখানে আরেক সমস্যা। ওয়ান বেডরুম-এপার্টমেন্টে দু'জন থাকা যাবে, বাচ্চা রাখা যাবে না। টু বেড রুম এপার্টমেন্টের ভাড়া আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব, এটাও বাতিল। আরেক দিন আরেকটা এপার্টমেন্ট পছন্দমতো এবং শর্তমতো মিললো। মার্সেলার এপার্টমেন্টের কাছে একটা এবভ-লেভেল বেসমেন্ট-এপার্টমেন্ট, অর্থাৎ অর্ধেক অংশ মাটির নীচে। ঢাকাতে টেলিফোন করতেই বাবলীর ভেটো 'না মরতেই মাটির নীচে থাকতে হবে এটা আবার কেমন কথা! ওখানে আমার মেয়েকে নিয়ে আমি থাকতে পারবো না।' বেসমেন্ট-এপার্টমেন্ট সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা না থাকায় আমার স্ত্রীর ঝাঁঝালো মন্তব্যে এটাও বাতিল হলো। বাধ্য হয়ে হোটেলে খরচের কথা বিবেচনা করে উঠলাম গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের Wisely Seminary-এর Stroughim ডর্মে। এ ডর্মে আমাকে প্রায় মাস-খানেক সময় থাকতে হয়েছিলো। ডর্মের একটা অংশে ছিলো কমন কিচেন। অনেকেই রান্না করে খেতো। হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-পেয়ালা সবই ছিলো ওখানে। শুধু কাঁচা বাজার করে রান্না চাপানো। বাইরের খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছিলো। তাছাড়া খরচের বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই আমিও স্ত্রীর লিখে দেওয়া-বিদ্যার ওপর ভরসা করে রান্না শুরু করলাম। বিশাল রান্না ঘরের ভেতরেই ফ্রিজ এবং খাবার টেবিল। একদিন মুরগীর মাংস এবং ভাত খাচ্ছি। এক ছোকরা এসে সরাসরি প্রশ্ন করলো-

: হাই! তুমি কি খাচ্ছো?

: ভাত ও মুরগীর মাংস।

: আমি কি একটু খেয়ে দেখতে পারি?

আমার কোনরূপ উত্তরের অপেক্ষা না করেই একটা চামচ নিয়ে আমার অর্ধেক খাওয়া খাবার থেকে খানিকটা নিয়ে খেয়ে ফেললো। আমি ওর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। 'খুবই মজা হয়েছে, খুবই মজা হয়েছে' বলে ও মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। আলাপ জমে উঠলো আধ-পাগলা এই ছেলেটির সাথে। নাম ডেভিড মাকসুদা। পূর্বপুরুষ কোনো এক কালে জাপান থেকে এসেছিলো বলে 'মাকসুদা' নামটি এখনো ধরে রেখেছে। এখানে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করছে। আমার একটি ছোট আদরের বোন ছিলো। খুব ছোট থাকতেই ওকে

www.pathagar.com

হারিয়েছি। ওর ভালো নামের একটা অংশ ছিলো মাকসুদা। তাই ডেভিড এর সাথে আলাপ জমতে আমার সময় লাগলো না। ঐ ডর্মে থাকাকালীন অনেক অলস মুহূর্ত ওর সাথে গল্প করে কাটিয়েছি, ওর কোনো কোনো মিষ্টি অত্যাচার সহ্য করেছি খুশি মনে। একদিন ক্লাশ থেকে ফিরে লাঞ্চ করতে গেছি। ফ্রিজ খুলে দেখি আমার মুরগির মাংসের পাত্রটি একেবারে ফাঁকা। ওপরে এক টুকরো কাগজে ছোট একটি নোট 'তোমার চিকেন-কারির লোভ সামলাতে পারলাম না। ফ্রীজের তিন নম্বর তাকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় রক্ষিত হলুদ বাক্সের খাবার তুমি খেয়ে নিয়ো ডেভিড।' আরেক দিন চাল কিনে রুমে ফিরছি। ডেভিডের সাথে দেখা করিডোরে।

: কি কিনে আনলে?

: চাল।

: তুমি চাল কিনতে গেলে কেন? কিচেনের ডান কোণার বড় চালের ব্যাগটি কি তুমি দেখোনি? ওখান থেকে চাল নিয়ে খাবে।

: এতো বড়ো চালের ব্যাগ তুমি কিনেছো কেন?

: আমি কিনবো কেন? কে কিনেছে কে-ই বা জানে। ওখানে চাল আছে, আর তোমার চালের প্রয়োজন আছে; নিয়ে খাবে।

নির্দ্বিধায় ওপরের কথাগুলো বলে নিজ রুমে ঢুকে পড়লো ডেভিড।

আর একদিন কি-একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমার রুমে ঢুকলো।

: জানো, আজকের কাগজে একটা মজার খবর বেরিয়েছে। এক জরিপে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত পতিতালয়ের পতিতাদের মধ্যে এইডস রোগ নেই বললেই চলে।

: এটা তো ভলো খবর? এর মধ্যে তুমি মজা পেলে কোথায়?

: মজা পেলাম এ রকম হওয়ার কারণের মধ্যে। এখানকার পতিতারা খদ্দেরদের কাছে যাওয়ার পূর্বে এক ধরনের প্লাষ্টিকের কভার ব্যবহার করে যা-নাকি খদ্দেররা বুঝতেই পারে না। বিষয়টি কি মজার হলো না? তুমিই বলো।

ঐ ডর্মেই পরিচয় হয়েছিলো ডেভিডের ঠিক উল্টো স্বভাবের শান্ত ধীর স্থির মেয়ে মার্শার সাথে। পেনসিলভেনিয়ার মেয়ে মার্শাও দর্শনের ছাত্রী। অনেক দিন বিকেলেই কোনো প্রোগ্রাম না থাকলে ডর্মের লনে বসে থাকতাম। স্ত্রী এবং মেয়ের কথা ভেবে মনটা খুবই খারাপ থাকতো। একদিন মার্শার কাছেই পরিবারের সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করছিলাম।

: দেখো, আমি যখন দুই বৎসর আগে পেনসেলভেনিয়া থেকে এখানে আসি আমার মনের অবস্থা ছিলো তোমার মতো। তুমি এতোদূর থেকে এসেছো, আর তাছাড়া তোমার একটি সন্তানও আছে, আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি।

কথা শেষ করে মার্শা নিজের চোখ মুছতে লাগলো। সেটা আমার দুঃখের জন্যে নাকি ওর অতীত দুঃখের কথা স্মরণ করে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

www.pathagar.com

ঐ ডর্মে থাকা অবস্থায়ই একদিন সকালে কিটি এসে হাজির। তুমি আর মার্শেলা যেহেতু পারলে না, তাই শেষ পর্যন্ত আমাকেই নামতে হলো। চলো, তোমার শর্ত মোতাবেক একটা এপার্টমেন্ট পাওয়া গেছে। এবার আবার অপছন্দ করে আমকে আর ভুগিয়ো না। চললাম কিটির সাথে। সত্যিকারেই, কিটি পছন্দমতো একটা এপার্টমেন্ট জোগাড় করেছে, যা নাকি আমার সকল শর্তই পূরণ করে।

: কিটি, তুমি কি তোমার ইহুদী লবী ব্যবহার করে এতো কম ভাড়ায় তোমাদের একজন হামফ্রে ফেলোর জন্যে এতো সুন্দর একটা এপার্টমেন্ট জোগাড় করলে?

: এতো কিছু তোমার জানার দরকার নেই। এপার্টমেন্ট তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বলো?

মুচকি হেসে বৃদ্ধা কিটি শেষ উইন আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলো। গ্লোভার পার্কের ঐ এপার্টমেন্টে একটা বৎসর ভালোই কেটেছে।

আমেরিকায় বাসা খোঁজার ব্যাপারে একটা সত্যি ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। ঘটনাটি ঘটেছিলো বন্ধু মাহমুদ খানের জীবনে। মাহমুদ এখন যুক্তরাষ্ট্রের টিউলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। স্ত্রী-পুত্র-বাড়ী-গাড়ী নিয়ে ভালোই আছে এখন। ঘটনাটা ওর মুখ থেকেই শোনা। ও তখন ওর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে স্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে গেছে। ক্যাম্পাসে বাসা না পেয়ে আমার মতোই বাইরে বাসা খুঁজছে। একদিন খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এক বাড়ির মালিকের সাথে আলাপ। বাড়ির মালিক ওকে বাড়িতে পৌঁছানোর রাস্তা ঘাট সম্পর্কে ধারণা দিলো। একটা চিহ্নিত স্থান থেকে ডান দিনে মোড় নিলে যেতে পাঁচ মিনিট লাগবে বলে জানালো। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ডান দিকে মোড় নিয়ে মাহমুদ হাঁটছে তো হাঁটছেই। পাঁচ মিনিটের জায়গায় পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর পাবলিক বুথ থেকে আবার ফোন করলো বাড়ির মালিককে।

: তুমি তো ঐ স্থান থেকে পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট লাগবে বললে। আমিতো পঁচিশ মিনিট হাঁটলাম। তোমার বাড়ী আর কতোদূর?

: দুঃখিত, আমি তো ভাবিনি যে তুমি হেঁটে আসবে। আমি পাঁচ মিনিটের দূরত্বকে গাড়ীর পথ বুঝিয়েছি। হাঁটা পথ নয়।

গ্লোভার পার্কের ফরটিয়েথ প্লেস রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তের টুইন হাউজের নীচতলার একটি এপার্টমেন্ট। বাড়ী থেকে বের হয়ে ডান দিকে একটু বাঁক ঘুরলেই একটি ছোট্ট বনভূমি। ঘর থেকে পা বাড়ালেই সবুজ ঘাসের কার্পেটে ঢাকা এক চিলতে লন। পেছনের লনে আছে বার্বিকিউ করার চুলা, লেকের জলে বেড়ানোর উপযোগী ছোট্ট একটি বোট। ঐ বোটটি কেউ কোনোদিন ব্যবহার করেছে কিনা বলা মুশকিল। অধিকাংশ বাড়ীর অধিবাসীই ছাত্র-ছাত্রী কিম্বা নব-দম্পতি। সামারের সময় প্রায় প্রতিটি লনেই যুগলদেরকে রৌদ্রস্নান করতে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার রাবারের তৈরী বিশাল বাথটাব লনে পেতে শরীরটাকে পানির মধ্যে পুরে হয়তো বা কাটিয়ে দিলো সারাটি দুপুর। এ দেশের অধিকাংশ

www.pathagar.com

এলাকায়ই বাড়ীগুলোতে কোনো সীমানা দেয়াল নেই। কোনো কোনো বাড়িতে সাধারণ কাঠের চিলতে দিয়ে ফেন্সিং করা হয়েছে মাত্র। জমির প্রাচুর্যের কারণে হয়তোবা সীমানা নিয়ে অতোটা মাথা ঘামায় না কেউ। আবরণের অভাব সামনের লনের সূর্য-স্নানে কোনোরকম বাধা হয়ে ওঠেনি। সামারের উচ্ছল আর প্রাণবন্ত দিনগুলোতে সামনের কিম্বা পেছনের লনে বার্বিকিউ পার্টিতো নিত্যদিনের বিষয়। পাশের এপার্টমেন্টে নতুন একটি পরিবার এসে আয়োজন করেছিলো আইসক্রীম সৌশ্‌ল-এর। উদ্দেশ্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। শীতকালে হলে বোধহয় পার্টিটার নাম হতো কফি-সৌশ্‌ল কিম্বা টি-সৌশ্‌ল।

অক্টোবর থেকেই গ্লোভার পার্কের গাছগুলোর পাতার রঙ বদলাতে শুরু করেছে। এ দেশে এ এক অদ্ভুত সৌন্দর্য যা ভাষায় বর্ণনা করা দুরূহ। শীত আসার আগেই কোনো গাছের পাতা হলুদ, কোনোটির সোনালী, কোনোটির বা আরেকটু গাঢ় হয়ে একেবারে বাদামী আবার কোনো গাছের পাতা তখনো সবুজ। হালিম ভাই ও ভাবী এর মধ্যে একদিন নিয়ে গেলেন তাঁদের বাড়ী, মেরিল্যান্ডের গেইথেসবার্গে। সারাটা পথ জুড়েই হলুদ আর সোনালী পাতার মেলা। নীল আকশের সঙ্গে যেন ওরা মিতালী পাতিয়েছে। কয়েকদিন পর সবগুলো গাছই পাতাশূন্য হয়ে যাবে— ন্যাড়া-মাথা ঐ গাছের ডালে বরফ-জমা শুভ্রতাকে নিয়ে আবার হাজির হবে অন্য এক রূপ।

এদেশে সাধারণত আবাসিক বাড়ির ফ্লোর নির্মাণ করা হয় কাঠ দিয়ে। কার্পেট দিয়ে ফ্লোর ঢেকে দেওয়া, বাড়ির মালিক অথবা ভাড়াটিয়ার জন্যে বাধ্যতামূলক। আমাদের দালানে ভাড়ার চুক্তিপত্র অনুযায়ী ওটা ভাড়াটিয়ারই করার কথা। ওপরের এপার্টমেন্টের ভাড়াটিয়া এ্যান চুক্তি ভঙ্গ করে তার ফ্লোরটি অনাবৃতই রেখেছিলো, আর তার মাশুল দিতে হচ্ছিলো আমাকে। তার সুউচ্চ হিল-জুতার খট্ খট্ ধ্বনির অত্যাচারে আমার জীবন দুর্বিসহ হওয়ার অবস্থা। তখনো তার সঙ্গে কোনোরকম পরিচয় হয়ে ওঠেনি। কিছু বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছিলো। একদিন বাড়ীর মালিক মিস্টার প্যাটনারকে টেলিফোন করে বিষয়টা জানালাম। পর সন্ধ্যায়ই আমার দরোজায় টোকা পড়লো। আগুন্তক শ্রীমতি এ্যান। তন্বী সুন্দরী এ্যানের একমাত্র দূর্বলতা বোধ হয় তার দৈহিক উচ্চতার ঘাটতি। সেই ঘাটতি ঢেকে রাখার জন্যে তার শুভ্র পদযুগলে সব সময় শোভা পেতো সুউচ্চ হিল-জুতো। সে যাই হোক, এ্যানের বক্তব্য প্রধানত দু'টি; প্রথমত, তার ফ্লোর হতে সৃষ্ট শব্দের কারণে যে অসুবিধা হয়েছে তার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করছেন। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতেও তার ঐ শব্দের অত্যাচার আমাকে নীরবে সহ্য করে যেতে হবে। তার যুক্তি, আর মাত্র কয়েক মাস তিনি এই এপার্টমেন্টে থাকবেন। এর জন্যে এতো পয়সা খরচ করে তিনি কার্পেট কিনতে যাবেন কেন? হাড়-কিপ্‌টে প্যাটনারেরই উচিত ছিলো ফ্লোরগুলো কার্পেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া। আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, একটা পুরনো কার্পেট কিনে ফ্লোরটিকে ঢেকে নিলেইতো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এ্যান তা মানতে নারাজ। ওর মতে কার্পেট

www.pathagar.com

দিয়ে ফ্লোর ঢাকা না ঢাকা কোন সমস্যাই নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে প্যাটনারের নিকট আমার অভিযোগ। সবশেষে ভদ্রতার মাথা-খেয়ে, তাকে, ঘরের ভেতর হিল জুতা ত্যাগ করে হাঁটাহাঁটির পরামর্শ দিলাম। আমার এ রকম বে-রসিক প্রস্তাবে তিনি মনক্ষুণ্ন হলেন এবং এই বিষয়ে আমার মৌনতাই সবচেয়ে সহজ সমাধান বলে তিনি পুনরায় অভিমত দিলেন। মনে পড়লো কয়েকদিন আগে Conflict resolution and problem management নামে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স করছিলাম। তারই একটা পরামর্শ কি সুন্দরভাবে হুবহু মিলে যাচ্ছে এ্যানের প্রস্তাবের সঙ্গে।

নিউইয়র্কের এক এপার্টমেন্ট ভবনে অনেকগুলো এপার্টমেন্ট। সেই তুলনায় এলিভেটর, অর্থাৎ লিফটের আয়তনটি খুব ছোট। কার্যতই এলিভেটরের সামনে সব সময় দীর্ঘ লাইন। এই বিষয়ে ভাড়াটিয়াদের অভিযোগ শুনতে শুনতে এপার্টমেন্ট মালিকদের কান ঝালাপালা। এলিভেটরের সংখ্যা বাড়ানো কিম্বা আয়তন বড় করতে গেলে এপার্টমেন্টের একটা অংশ ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। ওতে খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশী। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় বের করার জন্যে বেচারা এপার্টমেন্ট মালিক হাজির হলেন এক বিলেতী পরামর্শকের কাছে। উচ্চহারের পরামর্শ ফি এবং অতি সামান্য বিনিয়োগের বিনিময়ে তিনি সমস্যার সমাধান দিলেন। কি ভাবে? ভদ্রলোক বিশাল একটা আয়না নীচ তলায় এলিভেটরের গোড়ায় লাগিয়ে দিলেন। সুচতুর পরামর্শকের এই বিদ্যাটা জানা ছিলো যে মানুষ নিজের চেহারা, তা যতোই কুৎসিত হোক না কেন, দেখতে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করে। বাইরে থেকে ফিরে এলিভেটরের গোড়ায় ভিড় দেখলে অধিকাংশ যাত্রীই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেত, কেউবা চিরুনি হাতে, কেউবা টাই-এর নট ধরে। আয়না বসানোর পর থেকে এপার্টমেন্ট মালিককে আর কোনো অভিযোগ শুনতে হলো না। পরামর্শকের যুক্তি : এলিভেটর থাকা-না-থাকা এখানে কোনো সমস্যা ছিলো না। সমস্যা ছিলো এপার্টমেন্ট-মালিকের কাছে ভাড়াটিয়ার অভিযোগ। সেটা বন্ধ হয়েছে। সেই থেকে বোধ হয় এলিভেটরের গোড়ায় এবং ভেতরে আয়না লাগানোর প্রচলন। সে যাই হোক, অনুরোধে মানুষ নাকি ঢেঁকিও গেলে। আমি ঢেঁকি গিললাম-না সত্য, তবে সুন্দরী এ্যানের হিল-জুতার খট্ খট্ সুমধুর ধ্বনি কর্ণ দিয়ে গ্রহণ করে যাবার প্রস্তাবে আপাতত সম্মতি দিতে হলো। আমার মতো ভালো প্রতিবেশী খুব কমই আছে, ইত্যাদি ধরনের নানারকম মন্তব্যের পর এ্যান সে সন্ধায় বিদায় নিলো।

প্যালেস্টাইনের হাম্মাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কিছুদিন পূর্বেই। এক বিকেলে আমার বাসায় এসে হাজির। ওকে বসার রুমে রেখে কফি বানাতে ভেতরে ঢুকেছি। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাম্মাদের খেদোক্তি—তোমার খোলা দরজা দিয়ে কুকুর ঢুকে পড়েছিলো। কোনো কিছু না-পাক করার আগেই আমি বজ্জাতটাকে দূর দূর করে বের করে দিয়েছি। কফি পান করতে করতে হাম্মাদের নানরকম উপদেশ: ইমান-আকিদা ঠিক রাখতে হলে এসব না-পাক জানোয়ার এবং না-পাক জেনানা থেকে দূরে থাকতে হবে। শরাব এবং সাকীদের সংস্পর্শ

www.pathagar.com

থেকে দূরে থাকার নানারূপ ফন্দি-ফিকির বাতলিয়ে আমার কক্ষে মাগরেবের নামাজ আদায় করে এবং করিয়ে সে বিদায় নিলো। ওর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা এবং রুদ্রমূর্তি ধারন করে শ্রীমতি এ্যানের আগমন। এবারের অভিযোগ গুরুতর। তার প্রিয় ডগি, এলিসকে আমার অতিথি ঘর থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি পায়ের জুতো খুলে ওকে মারতেও উদ্যত হয়েছে। আমার অতিথি নিষ্ঠুর এবং বিবেকবর্জিত। আমি এর একটা বিহিত না করলে স্থানীয় পশু-অধিকার-রক্ষা সমিতির কাছে হাম্মাদের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকে দেবে। মহা মুশকিলে পড়া গেল। যাই হোক, হাম্মাদের প্রতি পাজি-নচ্ছার জাতীয় গালাগাল বর্ষণ করে এবং এলিসকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী উপাধি দিয়ে সে যাত্রা এ্যানের মন রক্ষা করা গেল। এ্যান এলিসের গলা জড়িয়ে, ওর গোলাপী ওষ্ঠের চুম্বনে চুম্বনে এলিসের মুখমণ্ডল ভরিয়ে ফেললো। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে আমি শুধু এলিসের প্রতি ঈর্ষাই অনুভব করলাম।

অল্প কয়েকদিন পরই এ্যানের জুতার খট্ খট্ সুরধ্বনির হাত থেকে আমি মুক্তি পেলাম। আমার স্ত্রী ও মেয়ে এসেছে কয়েকদিন হলো। হঠাৎ এ্যানি কোথা থেকে কয়েকটা কার্পেট নিয়ে উপস্থিত।

: আমার ফ্লোরের ঐ শব্দ শুনিয়ে তোমাকে ডিসটার্ব করেছি এতোদিন। কিন্তু তোমার বউ-বাচ্চাকে বোধ হয় ডিসটার্ব করা ঠিক হচ্ছে না। তাই ফ্লোর কার্পেটে মুড়ে দেবো।

অনেকগুলো ডলার খরচ করে এ্যানি কার্পেট কিনলো, তবুও হিল পরা ত্যাগ করতে-পারলো না। পাদুকা-প্রীতির এই বিষয়টিকে কি ইমেলদা-মার্কোস-সিনড্রোম বলা যায়?

কয়েকদিন ধরেই আকাশটা একটু মেঘলা যাচ্ছিলো। নভেম্বরের তিন তারিখ ভোর-বেলা জানালা খুলেই দেখি প্রকৃতি আজ রোদে ঝলমল করছে। সকালের সূর্যের কাঁচা আভা সোনালী পাতায় পড়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, যে-রূপের বর্ণনা একজন শ্রেষ্ঠমানের ভাষাশিল্পীর পক্ষেই দেওয়া সম্ভবপর। এতোদিন এপার্টমেন্টটিতে একাই কাটাতে হয়েছে। আজকে আমার স্ত্রী ও মেয়ে আসছে ঢাকা থেকে। আজকের দিনটি এদেশের মানুষের জন্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকেই ওরা এদেশের বাহান্নতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে যাচ্ছে। বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ আর রস পেরো-এই তিনজনের মধ্য থেকে ওরা বেছে নেবে একজনকে; পরবর্তী চার বৎসর যিনি যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবেন, বিশ্বরাজনীতিতে থাকবে যাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সকাল বেলা-ই বেশ কয়েকটি ফোন পেলাম। বাবলী ও অন্তিকার আসার বিষয়ে খোঁজ-খবর নিলো বেশ কিছু সুহৃদজন। আমার মেনটর প্রফেসর রিচার্ডসন ফোন করে জানতে চাইলেন এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্যে সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা। কিটির সহযোগী ডেভিড প্রস্তাব করলো ছদ্মবেশ ধরে এয়ারপোর্টে যাওয়ার।

: ছদ্মবেশ কেন?

: ফান করার জন্যে। তুমি জানো না? স্বামী-স্ত্রী কিম্বা বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলে একজন আরেকজনের সামনে ছদ্মবেশ ধরে উপস্থিত হয়ে ফান করার রীতি রয়েছে এদেশে। তুমি চাইলে তোমাকে একটা কিছু সাজিয়ে দিতে পারি আমি।

www.pathagar.com

ওরা সব কিছুর মধ্যেই ফান খুঁজে ফেরে। ফান করতে গিয়ে যে কতো লোকযে এ দেশে প্রাণ দিয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন অধ্যাপক বুকেনক্যাম্প বলেছিলেন, আমেরিকানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথমেই কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। দীর্ঘদিন এদের সঙ্গে চলাফেরা করলেই মাত্র এদেরকে তুমি বুঝতে পারবে। তা না হলে এদের প্রতি অথবা নিজের প্রতি হয়তো অবিচার করবে। তাছাড়া বহু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও বর্ণ নিয়ে গঠিত আমেরিকানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক হয় কিভাবে? কথাটা মনে রেখেছিলাম। তারপরও মনে হয়েছে অধিকাংশ আমেরিকান যে-কোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়েও বোধ হয় ফান করতে পারে। আরেকটি গুণ চোখে পড়েছে আমেরিকানদের যে কোনো বিষয়কেই সহজভাবে নেওয়ার অদ্ভুত এক ক্ষমতা রয়েছে ওদের মধ্যে। জুলী স্টেপেনেক বললো 'অনেক দিন মেঘলা থাকার পর আজ রোদ উঠেছে। তোমার মেয়েটি তোমার জন্যে সুন্দর দিন বয়ে নিয়ে আসছে।' জুলীর বাবা মি স্টেপেনেক সত্তর-এর দশকের প্রথম দিকে ইউএসএ আইডি-এর কর্মকর্তা হিসেবে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। জুলীর শৈশবের একটা অংশ কেটেছে ঢাকায়। ওর বাড়িতে পটলাক-পার্টি, নিউইয়ার্স-পার্টিসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। ঢাকায় বনানীর যে বাড়িতে ওরা থাকতো সেটার ঠিকানা সম্বলিত মার্বেল পাথরের নেম-প্লেটটি রেখে দিয়েছে ডাইনিং স্পেসের একটি কর্ণারে। ভালো ভালো কথা বলে মানুষের মন ভালো করে দেয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে জুলীর মধ্যে।

বিমান বন্দর থেকে বিশ্ব ব্যাংকের ড. সৈয়দ মাহ্মুদ (আক্তার)-এর গাড়িতে করে ওদেরকে নিয়ে যখন ঘরে ঢুকলাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। পাঁচটায় ভোট গ্রহণ শেষ হবার কয়েক মিনিট পর থেকেই ফলাফল আসতে শুরু করেছে। আমার প্রতিবেশীদের বেশিরভাগই 'দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি'-র ছাত্র-ছাত্রী। অনেকেই ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থক। কাজেই একটা চাপা আনন্দের আভাস পাচ্ছিলাম আশে-পাশে। কিন্তু কোথাও কোনো হৈ-চৈ নেই আমাদের দেশের মতো। নেই কোনো আনন্দ-মিছিল, বাজি-পোড়ানো কিম্বা শ্লোগান তোলার প্রতিযোগিতা।

বাইরে থেকে ফেরার সময় সিঁড়ির গোড়াতেই এ্যানের সঙ্গে দেখা। ও-ই আমাকে উৎফুল্ল চিত্তে ক্লিনটনের বিজয়ের সংবাদটি প্রথম জানালো। আমার প্রশ্ন-

: ক্লিনটনের বিজয়ে তুমি এতো খুশি কেন?

: হি ইজ হ্যান্ডসাম। আই লাইক হিম।

সহজ এবং সাবলীল উত্তর। আমার পাল্টা প্রশ্ন-

: শুধুমাত্র এই কারণে তুমি ক্লিনটনকে ভোট দিয়েছো?

: তা-ছাড়া সে অনেক কিছু করবে।

: অনেক কিছু কি করবে?

: অনেক কিছু মানে অনেক কিছু।

www.pathagar.com

ঘরে ঢুকেই আধো আধো বুলিতে আমার দু'বৎসর বয়েসী মেয়ের নানারূপ মন্তব্য—

: আব্বুর রান্না ঘর খুব সুন্দর!

কাঁচের জানালার ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড-এর লাগানো পর্দা ধরে টানাটানি। বাথরুমে ঢুকে বাথটাব ও আধুনিক শাওয়ার দেখে উত্তেজিত 'আব্বু এটা কি? ওটা কি?' করেই চললো কয়েকদিন। আরেক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো ওর ঘুম নিয়ে। শীতের দিন বলে তখন বাংলাদেশের সঙ্গে এগার ঘন্টার সময় পার্থক্য। বাংলাদেশের অভ্যাস মতো সে দিনে ঘুমাতে লাগলো আর সারারাত জেগে হৈ-চৈ। আমরা দু'জন অন্য কি কাজ করবো? ওকে সামলানোই-মুশ্‌কিল হয়ে দাঁড়ালো।

দু'তিন দিন যেতে-না-যেতেই বোধ হয় হানিমুন পর্ব শেষ। বায়না শুরু করলো 'আম্মু, চলো আমাদের বাড়ি যাই। আব্বুর বাড়িতে নানা নেই।' সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। শরীর এবং মনে একটা অসুস্থতার ভাব। সহপাঠী পোলাণ্ডের মাইক ও জিম্বাবুয়ের জুডিথ এক সন্ধ্যায় এলো ওদেরকে দেখতে। আমরা বসার রুমে কথা বলছি। কোনো এক ফাঁকে ফ্রিজ খুলে কতগুলো ডিম নিয়ে টিপে টিপে ভাঙ্গতে লাগলো সবার সামনে। বাবলী ধমকে উঠলো 'এটা তুমি কি করছো'। মাইক বললো, ভাঙতে দিন। ওটা ভেঙে মনের ঝাল মেটাচ্ছে বোধ হয়। আপনারা বলতে ছিলেন না যে ও ওর গ্রান্ডমা-দের মিস করছে? ডিম ভাঙাটা হচ্ছে ঐ-ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কখনো সারা ঘর ভরে চিনি ছিটিয়ে কখনোবা বাথ-টাবের ভেতর শুকনো কাপড় ফেলে কল খুলে দিয়ে ও ওর মনের ঝাল মেটালো কয়েকদিন।

কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই আবার স্বাভাবিক এবং পুরনো স্টাইলে দুষ্টুমি। এক সন্ধ্যায় গ্রীসের সহপাঠিনী ডোরা এসেছে বাসায়। বাবলীর কপালে টিপ দেখে এই নিয়ে ওর নানারূপ প্রশ্ন। কোনো এক ফাঁকে অন্তিকা ওর মায়ের টিপের পাতা খুলে একটি লাগিয়ে দিলো ডোরার কপালে। এই নিয়ে ডোরার সে কি উল্লাস! পরদিন মার্সেলা আর ওর বয়ফ্রেন্ড জেফ যখন বেড়াতে এলো তখনও সে একই কাণ্ড ঘটালো মার্সেলাকে টিপ পরিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য! জেফকে টিপ পরানোর একটু চেষ্টাও সে করলো না।

এদেশে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর মেন্টাল এ্যাডজাস্টমেন্ট প্রসেস নিয়ে গবেষণা হয়েছে প্রচুর। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টেশন-এর সময় এ-বিষয়ে একটা ক্লাশও করেছিলাম। গবেষণায় দেখা গেছে, এক-দুই দিন নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ দেখার উত্তেজনায় প্রায় সকলেই থাকে উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত। এই পর্বটিকে এরা নাম দিয়েছে হানিমুন-পর্ব। কয়েকদনি যেতে-না-যেতেই হানিমুন-পর্ব শেষ হয়, নিজ পরিবেশ এবং পরিবারের জন্যে মানুষের মন হয়ে উঠে উন্মুখ। এখানকার অচেনা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির বেড়াজালে জীবন হয়ে উঠে ক্লান্তিকর ও অসহনীয়। এই পর্বটিকে নাম দেয়া হয়েছে ডিপ্রেসিভ পর্ব। এই পর্বে মন এতো খারাপ হয় যে কেউ কেউ হয়তো বা আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করতে পারে। এ ভাবেই সময় পার হতে থাকে। এক সময় এখানকার অচেনা, বৈরী পরিবেশই হয়ে উঠে প্রিয়, কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ। এখানকার উন্নত পরিবেশের সোনালী জীবনের

www.pathagar.com

বেড়াজালে বাঁধা পড়ে অনেকেই আর নিজ দেশেও ফিরে যেতে চায় না। শিশুদের এ্যাডজাস্টমেন্ট প্রসেস নিয়ে কোনো গবেষণা হয়ে থাকলেও তার ফলাফল আমার জানা নেই।

এ্যানের একমাত্র সাথী ওর প্রিয় ডগি, এলিস। মাঝে মাঝে দুই-তিন বৎসর বয়সী ভাগ্নে জ্যাককে নিয়ে আসতো ওর বাসায়। জ্যাককে সাথে নিয়ে সামনের লনে এলিস-এর সঙ্গে খেলা করতো, আমার মেয়ে অন্তিকাকেও ডেকে নিতো ওদের সঙ্গে। এমনিতেই এলিস-কে দেখলে ভয়ে সটকে থাকতো অন্তিকা। তবে জ্যাক সঙ্গে থাকলে, হাই! বলে ওর সঙ্গে খেলায় মেতে যেতো। কিন্তু কিরকম একটা জড়তা যেন থাকতো ওর মধ্যে। হয়তো ওর ভাষা বুঝে উঠতে পারতো না বলেই এই জড়তা। বাঙ্গালী প্রতিবেশী বিশ্বব্যাংকের সালাউদ্দিনের সমবয়সী ছেলে শাকিবের সঙ্গে খেলার সময় ঐ জড়তাটা লক্ষ্য করিনি।

এক সন্ধ্যায় হালিম ভাই ও রুবী ভাবীর সঙ্গে গিয়েছি মেরিল্যান্ডের লেক ফরেস্ট মল-এ। অপূর্ব সুন্দর, সাজানো-গোছানো একটি আধুনিক মল। সেকি আনন্দ অন্তিকার: 'আব্বু সিঁড়ি ওপরে উঠছে'। দোকানে ঢুকেই দৌড়াদৌড়ি। কোথায় দৌড় দিয়ে ঢুকে, কি জিনিস যে টান দিয়ে নামায়, সে-দিকে খেয়াল রাখতে রাখতেই আমরা হাঁপিয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ পর, যখন আমরা মল থেকে বের হবার উদ্যোগ নিচ্ছি, সে নিজেই আমাদেরকে 'খোদা হাফেজ' জানাচ্ছে। ধরতে গেলে চিৎকার দেয় 'নিও না আমাকে এখান থেকে নিও না। আমি এখানেই থাকবো।'- বাসায় ফিরে বাবলীর খেদোক্তি -

: আমি বাবা এদেশে থাকতে পারবো না আমার মেয়েকে নিয়ে। দু'দিন হয়নি এদেশে, আর এর মধ্যেই আমাদেরকে বলছে, খোদা হাফেজ।

আসলে এ বয়সটাই বোধহয় এরকম। টডলার-বয়সী বাচ্চাদের দুস্টমীকে এ দেশের লোকজনও বেশ ভয় পায়। বিশেষত দু'বছর বয়সীদের এ দেশে 'টেরিব্‌ল টু' বলে ডাকা হয়। তবে এই বয়সী বাচ্চারা বোধহয় অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে। বাসে, ট্রেনে, পার্কে যেখানেই গেছি মুহূর্তের মধ্যেই সে বেশ-কিছু বন্ধু যোগাড় করে ফেলেছে।

কিছুদিন ওয়াশিংটনে থাকার পরই, আমার স্ত্রীর পেশাগত প্রয়োজনে, ওদেরকে দেশে ফিরে আসতে হয়। ওয়াশিংটন ডিসি-এর ডাল্লাস বিমান বন্দরে ওদেরকে বিমানে তুলে দিতে গেছি। সঙ্গে হালিম ভাই,ভাবী। অন্তিকা লাউঞ্জ দিয়ে ছোটাছুটি করছে। ওর ছোটাছুটি আর কথাবার্তা শুনে এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিজেই আলাপ জুড়ে দিলেন-

: আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই? খুবই চঞ্চল।

বাংলায় কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, ভাবছি কিছু একটা বলা প্রয়োজন, কিন্তু কি বলবো? ভদ্রলোক নিজেই আমাকে উদ্ধার করলেন।

: আমার নাম সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। আমি এ-দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত।

www.pathagar.com

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দৌহিত্র, পশ্চিম বঙ্গের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে ওঁর স্ত্রী মায়া রায়। হালিম ভাই (ড. মহিউদ্দিন হায়দার) চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুশল বিনিময় করলেন। ওঁর স্ত্রীর বোনকে সী-অফ করতে এসেছেন। আলাপ জমে উঠলো মুহূর্তের মধ্যে। নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা। আমাকে টিকেট, বোডিং-কার্ড নিয়েই ব্যাস্ত থাকতে হলো বেশী। হালিম ভাই ও ভাবীকে দেখলাম বেশ জমিয়ে নিয়েছেন ওঁর সঙ্গে। আমার মেনটর প্রফেসর রিচার্ডসনের সঙ্গে পিএইচডি করছে কোলকাতার মেয়ে শিনজিনি সেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলে কিছু হাল্কা হই। আমাকে ও কয়েকদিনই বলেছে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কথা। ও নিজেও ওর মায়ের দিক থেকে দেশবন্ধু পরিবারের মেয়ে। অনেক বার বলা সত্ত্বেও আর যাওয়া হয়ে উঠেনি। তাই আজকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালোই লাগলো। এক সময় বাবলী প্রস্তাব করে বসলো—

: আমার মেয়ের মাধ্যমেই আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো। তাই ওর সঙ্গে আপনার একটা ছবি তুলে রাখতে চাই। বড় হলে এটা ওর স্মৃতি হয়ে থাকবে। আপনার কি আপত্তি আছে?

: আপত্তি থাকার কি আছে? নিশ্চয়ই তুলবেন। একটা কেন, একাধিকই তুলুন না!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আমি ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। এক সময় আইএমএফ-এর ড. সামসুদ্দিন তারেক এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

: মাহবুব ভাই, ক্যামেরাটা আমার হাতে দিয়ে আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। আমি স্ন্যাপ নেই।

www.pathagar.com

ওয়াশিংটন ডিসি-র অনেক স্মৃতি

ওয়াশিংটন ডিসি'তে একটি বৎসর ভালোই কেটেছে। ওয়াশিংটন ডিসি'ই হচেছ আধুনিক বিশ্বের প্রথম পরিকল্পিত রাজধানী। মাত্র ঊনষাট বর্গমাইল জায়গার ওপর প্রায় দু'শ বৎসর পূর্বে রাজধানী শহরটিকে গড়ে তোলা হয়। নগরটির মূল স্থপতি পিয়েরি লাফান্ত নামের এক তরুণ ফরাসী। এ দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন নিজে রাজধানীর জন্যে স্থানটি পছন্দ করেছিলেন। পটোম্যাক নদীর তীরে অবস্থিত রাজধানীর জমি মেরিল্যান্ড ও ভার্জিনিয়া এই দু'টি অঙ্গরাজ্য থেকে ধার নেওয়া। ঊনষাট বর্গমাইল এলাকাবিশিষ্ট এই রাজধানী শহর আবার চারটি অংশে বিভক্ত; উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব। রাজধানী-শহরের প্রায় সব সরকারী দফতর এই ঊনষাট বর্গমাইল এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। আবার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের স্মৃতিতে নির্মিত ওয়াশিংটন মনুমেন্টের উচ্চতা পাঁচশ পঞ্চান্ন ফুট থাকায় এর চেয়ে উঁচু কোনো ভবন রাজধানী শহরে গড়া নিষিদ্ধ। তাই বলে কি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী-শহর মাত্র ঊনষাট বর্গমাইল এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ? প্রকৃতপক্ষে পার্শ্ববর্তী দু'রাজ্য মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়ার বিভিন্ন কাউন্টি রাজধানীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় কোন্ এলাকাটি রাজধানী শহর আর কোন অঞ্চলের মালিকানা মেরিল্যান্ডের কিম্বা ভার্জিনিয়ার তা স্বাভাবিক চলার পথে বোঝার উপায় নেই। একমাত্র দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে তা বুঝতে পারা যাবে। অনেকটা আমাদের ঢাকার সঙ্গে মিরপুর কিম্বা গুলশানের পার্থক্যের মতো অবস্থা। তা ছাড়া ওয়াশিংটন ডিসি'র মেট্রো সিস্টেম মাটির নীচ দিয়ে তার লাল, নীল, হলুদ আর কমলা লাইন দিয়ে ডিসি, মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছে যে বহু দূর-দূরান্ত থেকে নিত্যদিন রাজধানীতে এসে অফিস করা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসি'র অনেক কিছুই পর্যটকদের আকর্ষণ করবে। ন্যাশনাল গ্যালারী অব আর্ট, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, লিঙ্কন মেমোরিয়াল, জেফারসন মেমোরিয়াল, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, হোয়াইট হাউস, ভিয়েতনাম ভেটার্ন মেমোরিয়াল, বোটানিক্যাল গার্ডেন, কেনেডি সেন্টার, ক্যাপিটল ভবন, ন্যাশনাল আর্কাইভ, ন্যাশনাল ক্যাথিড্রাল, হাজারো ভবন, পার্ক ইত্যাদি।

www.pathagar.com

কিন্তু স্মিথসোনিয়ান কমপ্লেক্সই বোধহয় সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু। স্মিথসোনিয়ান কমপ্লেক্সের মাঝে রয়েছে বিরাট এক মল আর তার চারিদিকে নানা প্রকৃতির সব মিউজিয়াম এবং গ্যালারি। 'মল' শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। খোলা ভ্রমণস্থান এবং বিপণিকেন্দ্র। এ দেশে বিরাট বিরাট দোকান আর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশাল আকৃতির এক একটি মল অথবা বিশাল মল তৈরী করে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে মার্কেট প্লেস। যা বলছিলাম, স্মিথসোনিয়ান কমপ্লেক্সে ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রি, মিউজিয়াম অব আমেরিকান হিস্ট্রি, এশিয়ান মিউজিয়াম, আফ্রিকান মিউজিয়াম, ইত্যাদি নানান রকমের মিউজিয়াম আছে। আমার ওখানে থাকা অবস্থায়ই উদ্বোধন করা হলো হলোকোস্ট মিউজিয়াম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ইহুদি নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনাকে বিভিন্ন কায়দায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঐ হলোকোস্ট মিউজিয়ামে। কিন্তু সবচেয়ে আমাকে আর্কষণ করতে পেরেছিল এয়ার স্পেস মিউজিয়াম। এ দেশে প্রতি বৎসর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক এই মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করে থাকেন। রাইট ব্রাদার্সের প্রথম আবিষ্কৃত উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে চাঁদে অবতরণকারী এ্যাপোলো-১১ কিম্বা পরবর্তীকালে উৎক্ষেপিত খেয়াযান ডিস্কভারি প্রভৃতি সব গুরুত্বপূর্ণ আকাশযানই এ মিউজিয়ামটিতে স্থান পেয়েছে। মিউজিয়ামটি দেখেই বোধ হয় কয়েকটি দিন পার করে দেওয়া যায়। এতে রয়েছে একটি ছবিঘর। ওর পর্দাটির আকৃতি সাধারণ সিনেমা হলের পর্দার অন্তত দশগুণ বড় হবে বলে আমার মনে হয়। এ ছবিঘরে একাধিক ছবি দেখেছি বিভিন্ন সময়ে। লিভিং প্লানেট নামের একটি ছবিতে বিশাল একটি বেলুনে চড়ে এক ভদ্রলোক বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের এই পৃথিবীর গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণিত হচ্ছে নানারূপ তথ্যাবলী। দর্শকদের মধ্যেও বিশ্ব প্রদক্ষিণ করার একটা অনুভূতি জাগ্রত হচ্ছে; মনে হচ্ছে আমি নিজেই যেন এই বেলুনে চড়ে বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়েছি। কখনো চলে যাচ্ছি আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ওপর, কখনো বা শুভ্র বরফে আচ্ছাদিত এস্কিমোদের দেশে, কখনো বা একেবারে প্রতিবেশী দেশের তাজমহলের ওপরে। স্পেস সাইন্স মিউজিয়ামে আরো দু'টি জিনিস দেখে বেশ মজা পেয়েছি। একটি হলো চাঁদের মাটি, অপরটি হলো টিভিতে প্রচারিত জনপ্রিয় সিরিজ 'স্টারট্রেক'-এর ফ্লাইং স্টেজ। স্টারট্রেক সিরিজে যে ষ্টেজ-এ দাঁড়ালে অভিনেতা এ্যাষ্ট্রোনটদের দেহ শূন্যে মিলিয়ে যেতো, সেরূপ একটি স্টেজ বানিয়ে রেখে-দেওয়া আছে। ঐ সিরিজের ক্যাপ্টেন এবং তার অপর দু'জন সহযোগীর স্ট্যাচু সাজিয়ে রাখা আছে ঐ স্টেজে, একটি দাঁড়ানোর স্থান এখনো খালি। অর্থাৎ আরেকজন গিয়ে দাঁড়ানোর সাথে সাথে চারজনের দেহই শূন্যে মিলিয়ে গিয়ে তারা পৌঁছে যাবে মহাবিশ্বের অন্য কোন গ্রহে। আপনি নিজেও হতে পারেন বাকি একজন। কাজেই এ চার জনের বাকি একজন হওয়ার জন্যে স্টেজের সামনে ক্যামেরা হাতে লোকজনের ভীড় লেগেই আছে। কার আগে কে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবে। একসময় আমিও দাঁড়ালাম। ছবি উঠলো ঠিকই তবে শূন্যে মিলিয়ে

www.pathagar.com

অন্য গ্রহে যাওয়া? সে সুখের অভিজ্ঞতা না হয় আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররাই উপভোগ করবে।

ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, লিঙ্কন মেমোরিয়াল, ইত্যাদি ভবনে সাদা রঙ ব্যবহার করে এমন ভাবে আলো প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে রাতের বেলা ঐ ভবনগুলো থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি এক অপূর্ব দোতনার সৃষ্টি করে। অক্টোবরে ওভাল অফিসের বেঞ্জামিন ফ্যাঙ্কলিন হলে হামফ্রে ফেলোদের জন্যে একটা অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিলো রাতের বেলা। ওভাল অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লিঙ্কন মেমোরিয়ালের বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির আভা দেখে বিমোহিত হচ্ছি। এক সময় ভারতের অশোক এসে পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো-

: আপনি কী চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখেছেন? ওর বিচ্ছুরিত আলোর সঙ্গে কি এর কোনো ব্যতিক্রম আছে?

ব্যতিক্রম একটা আছে নিশ্চয়ই। তাজের বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি প্রাকৃতিক, আর এটা বিদ্যুৎ দিয়ে তৈরী। তবে খালি চোখে এই পার্থক্যটা বোঝা মুশকিলই।

ইথাকা থেকে একদিন কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী সহপাঠি চিসাকি ও নরিও এলো ওয়াশিংটন ডিসি দেখতে। আমার বাসায় ওদের জন্যে প্রোগ্রাম তৈরী করছি।

: তোমরা হোয়াইট হাউজ যেতে চাও?

: জোক করছ নাকি? ওখানে কি আমাদেরকে যেতে দেবে?

কিন্তু পরদিনই হোয়াইট হাউজে ঢুকে ওরা সত্যিই অবাক। আসলে এ দেশের প্রেসিডেন্টের বাসভবন সবার জন্যেই খোলা। যে-কেউ একটা নির্ধারিত সময়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ঢুকে যেতে পারে হোয়াইট হাউজে। তবে শুধুমাত্র নীচতলায়। বেড রুম, ব্লু রুম, চায়না রুম, লাইব্রেরী, ইস্ট রুম, ইত্যাদি সব কক্ষই ঘুরে ঘুরে দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। রেড রুমের পর্দা থেকে শুরু করে সোফা কার্পেট সব কিছুই লাল। ব্লু রুমগুলো তেমনি করে নীল। চায়না রুমটি কাঁচের সব আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। সাবেক ফার্স্ট লেডী জ্যাকুলীন কেনেডীই নাকি নিজ তত্ত্বাবধানে হোয়াইট হাউজকে সাজিয়েছিলেন মনের মতো করে।

হোয়াইট হাউজে গাইডেড ট্যুর নিয়ে মজার একটা সত্য ঘটনা পড়েছিলাম কোথায় যেন। প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন-এর তিন কিশোরী কন্যা মার্গারেট, জেসী এবং এলিয়েনর প্রায়ই পরিচয় গোপন করে ট্যুরিস্টদের সঙ্গে মিশে যেতো। এ ঘর ও ঘর দেখিয়ে গাইড যখন দর্শকদের এক্সিকিউটিভ ম্যানশন এ নিয়ে আসতো তখন ওরা উচ্চ স্বরে প্রেসিডেন্টের তিন কন্যা সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে অন্যান্য দর্শকদের বিব্রত করে তুলতো। কিশোর বয়সে মজা করার কি অভিনব পন্থা।

প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের আমলে নির্মাণ কাজ শুরু হলেও হোয়াইট হাউজে বসবাস তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস ও তাঁর প্রেসিডেন্টশীপের পুরো সময়টা ফিলাডেলফিয়ায় কাটিয়ে ১লা নভেম্বর ১৮০০ সনে শেষ চার মাসের জন্যে

www.pathagar.com

গিয়ে উঠতে পেরেছিলেন শুভ্র এই ভবনটিতে। প্রথম দিন হোয়াইট হাউজে উঠে ফিলাডেলফিয়ার স্ত্রী এবিগেইল কে যে-চিঠিটি লিখেছিলেন তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

> I pray heaven to bestow the best of blessing on this house and all that shall hereafter inhabit it. May none but wise and honest men ever rule under this roof.

জন এ্যাডামসের প্রার্থনা কতটুকু পূরণ হয়েছে তা আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের জীবনী লেখকরাই ভালো করে বলতে পারবেন। তবে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে শুভ্র এই ভবনটি বিশ্ব রাজনীতিকে-যে নানাভাবে প্রভাবিত করছে সে-কথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন থেকে শুরু করে বাহান্নতম প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন পর্যন্ত প্রায় সকলেরই ক্ষমতা লাভের পর প্রথম রাতটি হোয়াইট হাউজে কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিলো। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জ্যাকশন। জ্যাকসনের অভিষেক হয়েছিলো ৪ঠা মার্চ, ১৮২৯ হোয়াইট হাউজের অভ্যন্তরে। এর জন্যে পৃথক কোনো নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করতে নূতন প্রেসিডেন্ট রাজি ছিলেন না। হোয়াইট হাউজের দরজা সেদিন সকলের জন্যেই উন্মুক্ত রাখা হয়েছিলো। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা ছিলো জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর এই অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগদিয়ে আনন্দ করবে। বাস্তবে তা-ই হয়েছিলো। কাঁচের আসবাব-পত্র ভাঙা, ক্রীষ্টাল ভাঙা, মাতাল হওয়া, অজ্ঞান হওয়া, মারামারি করে রক্তাক্ত হওয়া ইত্যাদি ছিলো ঐ অনুষ্ঠানের নীট ফলাফল। অভ্যাগতদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই সে রাতে অক্ষত অবস্থায় ছিলেন। ভাগ্যগুণে নতুন প্রেসিডেন্ট তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর নিরাপত্তা প্রহরীরা বেষ্টনী দিয়ে একটি জানালা গলিয়ে তাঁকে বাইরে নিয়ে যায়। প্রথম রাতটি তাঁকে কাটাতে হয় একটি স্থানীয় হোটেলে।

আসলে হোয়াইট হাউজ কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের বাসভবনের ন্যায় অতোটা দেয়াল-ঘেরা এবং লোক চক্ষুর আড়ালে নয়। পেনসিলভানিয়া এভিনিউ দিয়ে হেঁটে বা গাড়িতে যাওয়ার পথে শিকের দেয়াল-ঘেরা হোয়াইট হাউজকে যে-কেউ দেখতে পারে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

ঐ দেশের কোনো স্থানকেই বোধ হয় ওরা জনগণের জন্যে নিষিদ্ধ করে না। একজন সাধারণ দর্শক সে যে-দেশেরই হোক না কেন এফবিআই অর্থাৎ ফেডারেল ব্যুরো অব ইন্টিলিজেন্স অফিসেও যেতে পারে। গাইডেড টুরিস্ট হিসেবে, পয়সা দেয়ার প্রয়োজন নেই। লাইন ধরে দাঁড়ালেই হলো। একদিন আমিও দাঁড়ালাম। বিভিন্ন ঘর ঘুরিয়ে নানারূপ যন্ত্রপাতি, নানান ধরনের অপরাধীদের ছবি দেখিয়ে এক সময় নিয়ে আসা হলো পরীক্ষাগারে। একমাত্র এই পরীক্ষাগারেই ডিএনএ এনালাইসিস করা হয়ে থাকে। আজকাল অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে ডিএনএ পরীক্ষা এক অব্যর্থ মাধ্যম। এর মাধ্যমে কতো

www.pathagar.com

নিরপরাধ লোক যে বেঁচে যাচ্ছে। একটা উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্রের কোনো এক ছোট শহরে বার বৎসর বয়সী একটি বালিকা ধর্ষিতা হলো। মেয়েটি তার মা এবং সৎ বাবার সঙ্গে থাকতো। ঘুমাতো বাবা মায়ের পাশের রুমে। এক সকালে মেয়েটিকে ধর্ষিতা অবস্থায় ওর বিছানায় পাওয়া গেল। পুলিশ এলো, তদন্ত হলো। যেহেতু বাড়িতে আর কোন পুরুষ লোক ছিলো না, পুলিশ সন্দেহ করলো সৎ বাবাকে। মেয়েটি যেহেতু ঘুমন্ত ছিলো তাই সে কিছুই বলতে পারলো না। মামলা চলাকালীন অবস্থায় মেয়েটিকে বাবা-মার কাছ থেকে সরিয়ে সামাজিক কাস্টডিতে নিয়ে রাখা হলো। ভদ্রলোক সামাজিকভাবে অত্যন্ত লজ্জাজনক অবস্থায় পড়লেন। বহুদিন মামলা চলার পর একসময় তার সাজাও হলো। ততোদিন ডিএনএ পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। দু'জন মানুষের ডিএনএ কখনো একরকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ধর্ষিতা মেয়েটির কাপড়ে লেগে থাকা শুক্রকিটের ডিএনএ এর সঙ্গে সৎ বাবার ডিএনএ এর কোনো মিল খুঁজে পেলেন না বিজ্ঞানীরা। নিরপরাধ বাবা ছাড়া পেলেন। পুলিশের সন্দেহ পড়লো অন্য আরেক জনের প্রতি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আসল অপরাধীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিলো। কাঁচের জানালা খুলে ঘুমন্ত মেয়েটিকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পর মেয়েটিকে আবার সযত্নে যথাস্থানে রেখে গিয়েছিলো ঐ তরুণ অপরাধী। এতো কিছুর পরও মেয়েটির ঘুম ভাঙেনি। একেই বোধহয় বলে রিপভ্যান উইঙ্কল্ স্লীপ।

শেষ পর্যন্ত নতুন প্রেসিডেন্টের অভিষেক এর দিনটি প্রায় চলেই এলো। আর তিন দিন পর অর্থাৎ বিশে জানুয়ারী বিল ক্লিনটন এবং আল গোর নতুন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেবেন। তার জন্যে কয়েকদিন আগে থেকেই রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি আনন্দে মেতে উঠেছে। সতের তারিখ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান-মালা শুরু হচ্ছে স্মিথসোনিয়ান কমপ্লেক্সের মল-এ। সতেরো তারিখ রবিবার, ছুটির দিন। তাই সকাল থেকেই রাজধানীর চারিদিক থেকে মানুষ উপচে পড়েছে স্মিথ সোনিয়ান কমপ্লেক্সের মল-এর দিকে। মক্কার লোক হজ্ব পায় না বলে একটি কথা আছে। আমার হলো সেই অবস্থা। বাড়ি থেকে বের হয়ে বাসে চাপলে মাত্র পনেরো মিনিটের পথ। তাও পৌঁছলাম গিয়ে দুপুরের পর। রাস্তায় যে এতোটা ভীড় হবে তা আগে বুঝতে পারিনি। তাছাড়া সারা পথ জুড়েই এতো কিছু দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পথই কেঁড়ে নিয়েছে। তাই আগ-বিকালে যখন মল-এ পৌঁছলাম তখন কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বিশাল মল-এর বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্যান্ডেল টাঙানো হয়েছে। টাউন হল, হেরিটেজ হল, রি-ইউনিয়ন হল, ফ্রিডম হল, কমিউনিটি হল, ফ্যামিলি প্লে-গ্রাউন্ড, নেইবারহুড ডিনার, ইত্যাদি নামের সব প্যান্ডেল। একেকটি প্যান্ডেলে একেকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একেক রকম কাণ্ড কারখানা। প্রচণ্ড ভিড়ে জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবুও সবগুলো প্যান্ডেলেই ঘুরে ঘুরে বুঝতে চেষ্টা করলাম কোথায় কি হচ্ছে।

মল-এর এক পাশে বোর্ড দিয়ে বিশাল একটা দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। সেই দেয়ালে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল কিম্বা গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকার শুভেচ্ছাবাণী, মন্তব্য, অনুরোধ, দাবি-সম্বলিত

www.pathagar.com

বিভিন্ন পোস্টার সেঁটে দিয়েছে। বসনিয়া সমস্যা, প্যালেস্টাইনের শান্তি চুক্তি, লাইবেরিয়া, সোমালীয়া, কাশ্মীর, প্রবাসী ইরান সরকার, ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ কিম্বা মন্তব্য রয়েছে এসব পোষ্টারে। এসব রাজনৈতিক বিষয় ছাড়া বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় সমস্যা, পরিবেশ রক্ষার আবেদনসম্বলিত পোস্টার, দীর্ঘ বিবৃতি, সংবাদের বিবরণ, ইত্যাদি ঐ দেয়ালে সেঁটে দেওয়া আছে। আরো রয়েছে গে-লেসবিয়ান আন্দোলন এবং বর্ণবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ওপর নানারূপ কার্টুন এবং ছবি। কোনো কোনো পোস্টারের ওপর আবার কোনা কোনো রসিকজন বিভিন্ন রসালো মন্তব্য লিখে দিয়েছেন, যা দেখে না হেসে পারা যায় না, যেমন:

------বিল, আমার বয়স ২২,
শরীরের মাপ----
যোগাযোগ কর প্লিজ---------- ।
-------- হিলারীর চেয়ে সুন্দরী ।
তোমাকে পেতে চাই বিল,
অন্তত--------- ।

এমনি ধরণের হাজারো সব পোস্টার। গণতন্ত্র আর পরমতসহিষ্ণুতার দেশ। তাই কেউ ঐ পোস্টারগুলো খুলে ফেলছে না। শান্তি শৃংখলার কাজে নিয়োজিত পুলিশের সামনেই বিভিন্ন জন পোস্টার গুলো সেঁটে দিচ্ছে দেয়ালটিতে।

মল থেকে বের হয়ে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট ঘুরে যখন লিঙ্কন মেমেরিয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করছে। স্টেজ থেকে অনেক দূরের দর্শকরা যেন সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পারে তার জন্যে কিছুটা দূরে দূরে সিনেমা হলের মতো বিশাল আকৃতির কয়েকটি স্ক্রীন টাঙানো হয়েছে। যারা সরাসরি স্টেজের অনুষ্ঠান দেখতে পাচ্ছে না, তাঁরা ঐ পর্দায় স্পষ্টভাবে সব কিছুই দেখছে। এক সময় সংগীতানুষ্ঠান শেষ হলো। প্রথমে আল গোর এবং পরে ক্লিনটন ভাষণ দিলেন ঐ স্টেজে দাঁড়িয়ে। তারপর শুরু হলো আতশবাজির খেলা। কতো রকম বাজি-যে পোড়ানো হলো, আকশে কতো যে তার রূপ, তা বর্ণনা দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া দায়। সারারাত ধরে ওদের অনুষ্ঠান চলবে কিনা কেই বা জানে। এক সময়তো বাড়ি ফিরতেই হলো। বাড়িতে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে টিভি খুলে বসেছি। টিভিতে একটা আলোচনা অনুষ্ঠান হচ্ছে, বিষয়: ক্লিনটনের অভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যায় এবং এই অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া চাঁদার পরিমাণ। পক্ষে-বিপক্ষে দুদিকেই যুক্তি-তর্ক চলছে। আসলে এ দেশে কেউই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়; সব ক্ষেত্রেই জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে। জবাবদিহিতার আরেকটি নমুনা; এ দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর শপথ গ্রহণের পূর্বেই তিনি তাঁর সেক্রেটারী, অর্থাৎ মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করতে পারেন। সাধারণত তাই করা হয়।

www.pathagar.com

কারণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হবার পর সেক্রেটারী (অর্থাৎ মন্ত্রী) দের ঐ সংক্রান্ত বিষয়ের সিনেট সাব-কমিটি-র সামনে হাজির হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই পদ্ধতিকে ঐ দেশে সিনেট কনফারমেশন হিয়ারিং বলে। ক্লিনটন তাঁর এটর্নি জেনারেল হিসেবে নিযুক্তি দিলেন জো-ইবার্ডকে। মিসেস বার্ড বহুদিন ধরেই ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে জড়িত, ক্লিনটনের ঘনিষ্ঠজন। তাঁর স্বামী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক। মিসেস বার্ডকে সিনেট জুড়িশিয়াল কাউন্সিল-এর সামনে হাজির হতে হলো কনফারমেশন হিয়ারিং-এর জন্যে। ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান উভয় দলের সিনেট-সদস্যই রয়েছেন ঐ কমিটিতে। জেরার সামনে মিসেস বাড-এক সময় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে অবৈধভাবে বসবাসরত এক ল্যাটিন দম্পতিকে তিনি তাঁর বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্যে বাসার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। যেহেতু ঐ দম্পতির জন্যে সোশাল সিকিউরিটি কর দেয়া হয়নি, তাই তিনি কর-আইন এবং অভিবাসন আইন ভংগ করেছেন। জাঁদরেল সব সিনেটরদের সামনে সুন্দরী, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না জো-ই বার্ড-এর একেবারে নাজেহাল অবস্থা। তার ওপর আবার জেরা-পর্বটি সরাসরি টিভিতে দেখানো হচ্ছে সারা দেশবাসীকে। পরদিন জেরা চললো তার স্বামীর। এক জন আইনবিশারদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিভাবে এই আইন ভঙ্গ করলেন। মিসেস বাড-এর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনার ঝড় উঠলো। এ ধরনের হাজার হাজার লোক আইন ভঙ্গ করে এ দেশে এখনো বসবাস করছে এবং অনেকেই তাদেরকে চাকরিতে নিযুক্তি দিয়েছে। তবুও মিসেস বার্ড নৈতিকতা-বিরোধী কাজ করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন হতেই থাকলো। দু'একদিন পর সংবাদ পত্রে দেখলাম মিসেস বাড-এর অনুরোধে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাঁর নিযুক্তি বাতিল করেছেন।

বিশে জানুয়ারী সকালে বাসায় বসে টিভিতে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখলাম। নিয়ম অনুযায়ী ক্লিনটন কয়েকদিন ধরে হোয়াইট হাউজের প্রায় উল্টা পাশে অবস্থিত ব্লেয়ার হাউজে তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে আছেন। সকাল এগারটার সময় ক্লিনটন তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে হোয়াইট হাউজে যাবেন এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তাঁর পরিবার তাঁদেরকে হোয়াইট হাউজে রিসিভ করে সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন। ক্লিনটন তৈরি হয়ে ব্লেয়ার হাউজের করিডোরে দাঁড়িয়ে। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, মা-মেয়ের সাজ-সজ্জা আর বোধ হয় শেষ হয় না। ক্লিনটন উত্তেজিতভাবে মেয়ের নাম ধরে 'চেল্‌সি, চেল্‌সি' করে ডাকছেন। টিভিতে সারা দেশবাসী সবকিছু দেখছে। কয়েক মিনিট দেরী করে নতুন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজে পৌছলেন। তার আগে সকালে ক্লিনটন কালোদের একটা গীর্জায় গিয়ে তাঁর প্রার্থনা সেরেছেন। হোয়াইট হাউজের অনুষ্ঠানেও কবিতা পাঠ করলেন একজন কালো অর্থাৎ আফ্রিকান-আমেরিকান কবি। এটা নিয়েও কম বিতর্ক হলো না। কেউ কেউ বললো এটা অতি বাড়াবাড়ি, কালোদের এতোটা গুরুত্ব দেয়ার কি প্রয়োজন! ওরাতো নিজেদের এখন কালোও বলতে দেবে না। নিগ্রো থেকে হয়েছিলো

www.pathagar.com

কালো-আমেরিকান, এখন আবার বলতে শুরু করেছে 'আফ্রিকান-আমেরিকান'। আরেকটি দলের মতে 'এটা হচ্ছে ক্লিনটনের মহানুভবতা। জাতীয় ঐক্যের জন্যে এর প্রয়োজন ছিলো বৈকি।' কোনো কোনো আফ্রিকান-আমেরিকান আবার মন্তব্য করলো 'এটা হচ্ছে আমাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে শান্ত রাখার আফিম। আমরা কি কিছু বুঝি না ভাবছো? এটা হচ্ছে হাড়ে-হাড়ে একটা বর্ণবৈষম্যের দেশ।' যাহোক, এ জাতীয় বিষয় নিয়ে হাজারটা যুক্তি-তর্কতো হতেই পারে। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর ক্লিনটন ও হিলারী হোয়াইট হাউজের লনে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে হেলিকপ্টারে উঠিয়ে দিলেন। হেলিকপ্টারে উঠেও বুশ হাত নাড়তে লাগলেন। একসময় হেলিকপ্টারটি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

দুপুরের পর নতুন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক্যাপিটল ভবনে যাবেন। তাই একসময় ক্যাপিটল ভবনের পাশের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অতীতে হোয়াইট হাউজ থেকে ক্যাপিটল, এ পথটুকু এদেশের নতুন প্রেসিডেন্টরা হেঁটে পার হতেন। এখন নিরাপত্তার প্রয়োজনে বুলেট-প্রুফ গাড়িতে যান, অবশ্য খুব ধীর গতিতে। তবে হোয়াইট হাউজের সামনের মঞ্চে ক্লিনটন পায়ে-হেঁটেই গিয়েছেন বলে পরদিন কাগজে দেখেছিলাম। ক্লিনটন তাঁর উদ্বোধনী-ভাষণ দিলেন চৌদ্দ মিনিট। ষোলশ শব্দ উচ্চারণ করেছেন! এ নিয়ে গবেষণা আলোচনা আর তুলনার অন্ত নেই টিভি এবং কাগজগুলোতে। কোন্ প্রেসিডেন্ট কতো মিনিটের উদ্বোধনী-ভাষণ দিয়েছিলেন তার সব তথ্য ছাপিয়ে দেওয়া হলো পরদিনকার কাগজে। জর্জ ওয়াশিংটন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে মার্চ ৪, ১৭৯৩ তারিখে যে উদ্বোধনী-ভাষণ দেন তার ব্যাপ্তি ছিলো মাত্র একশত তেত্রিশটি শব্দের। মার্চ ৪, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সবচেয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসন। আট হাজার চারশত তেতাল্লিশটি শব্দ ব্যবহার করে দেওয়া ঐ ভাষণে সময় লেগেছিলো এক ঘন্টা দশ মিনিট। এর জন্য তাঁকে কম মূল্য দিতে হয়নি। দীর্ঘ ঐ ভাষণ দিয়েছিলেন ক্যাপিটল ভবনের খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। দিনটি ছিলো মেঘলা এবং শীতল। অথচ হ্যারিসন কোনো প্রকার হ্যাট কিম্বা গলাবন্ধ পরতে রাজি ছিলেন না। পরদিনই ঠাণ্ডা লেগে জ্বর, তার থেকে নিউমোনিয়া এবং এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু। তবে ভাষণের সময় নিয়ে সুন্দর একটা চুটকি বের করা হয়েছিলো স্থানীয় একটা কাগজে। প্রেসিডেন্ট জনসন নাকি মনে করতেন ভাষণ হচ্ছে প্রধানত দুই ধরণের। এক ধরণের ভাষণকে বলা যেতে পারে মাদার হিউবার্ড অর্থাৎ আলখেল্লা-মার্কা ভাষণ, যা সব কিছুকেই কভার করে কিন্তু কোনো কিছুকেই স্পর্শ করে না। আর এক প্রকার ভাষণ হচ্ছে বিকিনি ভাষণ যা শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু কভার ও স্পর্শ করে।

বেশ কয়েকদিন ওয়াশিংটন ডিসি-র বাইরে ছিলাম বলে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। গত রাতে বোস্টন থেকে ফেরার পথে অবশ্য ডুপন্ট সার্কেলের হোটেলগুলোর সামনের রাস্তায় ভিড় দেখেছি বেশ। তখনও বুঝে উঠতে পারিনি-যে ওগুলো গে এবং লেসবিয়ান অর্থাৎ সমকামী পুরুষ ও সমকামী নারীদের ভিড়। এখানে এসেছে ওদের সমাবেশে যোগ দিতে।

www.pathagar.com

রাস্তায় বের হয়েই বুঝলাম রাজধানীর ডাউন-টাউন আজ ওদের দখলে। মূল সমাবেশ-স্থল স্মিথ সোনিয়ান কমপ্লেক্সের মল। তবে শহরের সব হোটেলই ওরা দখল করে ফেলেছে। ওদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী ওরা সভা করবে মল-এ, মিছিল করবে হোয়াইট হাউজের সামনে। কোনো কোনো পত্রিকা খবর ছেপেছে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ওদের সামনে বের হয়ে কিছু বলবেন। ওদের দাবি, যৌন অভ্যাসের কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা চলবে না। সকল ক্ষেত্রে ওদেরকে সমান অধিকার দিতে হবে। সন্তান দত্তক নেওয়ার বিষয়ে কোনোরূপ বাধা নিষেধ দেয়া যাবে না। সেনাবাহিনীতে ভর্তির বিষয়ে ওদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। কয়েকদিন আগেই ডিসি'তে চেরী-ব্লোসম শেষ হয়েছে। চেরী ফোটার সেই দিনগুলোতে জাপানী সাদা ও গোলাপী চেরীতে হোয়াইট হাউজ, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, ক্যাপিটল ও মল-এর চারপাশ এক অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারন করেছিলো। কয়েকদিন না-যেতেই ঐ স্থান গুলো গে এবং লেসবিয়ানরা দখল করে নিলো। সামনে দিয়েই বিভিন্ন গে এবং লেসবিয়ান-যুগল তাদের পরিচয় জাহির করার জন্য নানা অঙ্গভঙ্গি করে সমাবেশ-স্থলের দিকে যাচ্ছে। নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিলো। ওদের সমাবেশ দেখতে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? কিন্তু এতো কাছে থেকে আমেরিকার সমাজের ভেতরের এই রূপটি দেখার সুযোগই-বা ছেড়ে দিই কিভাবে? হঠাৎ করেই জিম্বাবুয়ের সহপাঠিনী জুডিথ-এর সঙ্গে দেখা। জুডিথ যাচ্ছে হাসপাতালে ইরিন-কে দেখতে, সেখান থেকে কোনো সঙ্গী পেলে মল-এর দিকে যাবে। ভালোই হলো জুডিথ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে। একই সঙ্গে রথ-দেখা এবং কলা-বেচা দুই-ই হবে। ইরিন-এর একটা ক্যান্সার অপারেশন হয়েছে কয়েকদিন হলো। শহরের বাইরে থাকায় এখনো ওকে দেখতে যেতে পারিনি। অথচ অসুখটা ধরা-পড়ার পর সহপাঠিদের মধ্যে বোধ হয় খবরটা ও আমকেই প্রথম দিয়েছিলো। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা কয়েকটি সপ্তাহ এক সঙ্গে কাটিয়েছি। অসুখটার কথা জানতে পারার পর ওর সেকি কান্না। ওর বাবাও নাকি ক্যান্সারে মারা গেছেন। এ অসুখটা কি বংশগত? হাঙ্গেরীতে ওর মাকে কিছু না-জানিয়েই ইরিন একদিন অপারেশন করিয়ে ফেললো। হামফ্রে-প্রোগ্রাম থেকে স্বাস্থ্যবীমা করা ছিলো বলে চিকিৎসা পেতে কোনো সমস্যাই হয়নি। স্বাস্থ্য-বীমা করা না-থাকলে এ দেশে এরূপ চিকিৎসার কথা কল্পনাও করা যায় না।

জর্জ টাউন হাসপাতালে কিছুটা সময় ইরিন-কে দিয়ে যখন মল-এ পৌছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। এমনিতেই এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ বলে সামারের আমেজ শুরু হয়ে গেছে চারিদিকে। খোলামেলা পোশাক পরে হাজার হাজার গে-যুগল এবং লেসবিয়ান-যুগল পরস্পর প্রেম বিনিময় করছে। ওরা যেনো আজ বেপরোয়া হয়ে গেছে, ক্ষেপে গেছে। বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো ওরা প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে চাইছে অবগুণ্ঠন থেকে। তাই বোধ হয় এই প্রকাশ্য বহিঃপ্রকাশ, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্ববাসীর চোখে যা প্রকাশ্যে বেলেল্লাপনা। কেনো কোনো গে-যুগলের মধ্যে একজন আবার মেয়েদের-পোশাক এবং গহনা পরে সাজ-সজ্জাও করেছে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে এ শতাব্দীর প্রথম দিকে যাত্রা এবং থিয়েটারে পুরুষ শিল্পীরাই নাকি মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতো। সেটাতো ছিলো নাট্যমঞ্চের অভিনয়। আর এ-যে দেখছি জীবনের বাস্তবতা। লেসবিয়ান-যুগলদের দৃশ্য আরো ভয়াবহ। হাজার হাজার দর্শকের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে দু'টি প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অর্ধনগ্ন অবস্থায় প্রেম বিনিময় করছে, কোনো ন্যুড ক্লাব বা নাইট ক্লাবে নয়, খোদ রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি-র রাজপথে। দৃশ্যটা কল্পনা করেই দেখুন-না একবার। এ রকম একজন দু'জন নয়, হাজার হাজার যুগল। সমাবেশের আয়োজকদের মতে দশ লক্ষ। ডিসি পার্ক পুলিশের মতে তিন লক্ষ। অধিকাংশ সংবাদ মধ্যমের মতে উপস্থিতির সংখ্যা ছয়-সাত লক্ষ। শুধু মাত্র শ্বেতাংগই নয়, কালো এবং মিশ্র বর্ণের লোকেরও অভাব নেই। সাদা-সাদা জুটি, কলো-কালো জুটি, সাদা-কলো জুটিও রয়েছে বেশ। হাজার হলেও শত সংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙালী মন। এ-সব দৃশ্য দেখে দেখে মাথা গুলিয়ে যাবার অবস্থা। এক সময় জুডিথকে তাড়া দিলাম 'জুডিথ' এসব আর দেখতে পারছি না, চলো এবার যাই। ভালো লাগছে না মোটেও'। উঠতে উঠতে জুডিথ হেসে উত্তর দিলো 'তোমার অশ্বস্তির কারণটা বুঝতে পারছি। তবে ভুলে যাচ্ছ কেন যে তোমার সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছে।' ততোক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কিন্তু ওদের মঞ্চে তখনও বক্তৃতার খৈ ফুটছে। ফেরার পথে জুডিথের প্রশ্ন, এটাই কি আমেরিকান সমাজের ভেতরের রূপ? আমি কেনোরূপ উত্তর না দিয়ে শুধু ভাবতে লাগলাম।

বাসায় ফিরেও ঐ সব অসঙ্গত দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। একবার ভাবলাম, কি দরকার ছিলো এসব দেখতে যাওয়ার? আরেকবার মনে হলো, না-গেলে এ সমাজের এ-বিষয়টি নিজ-চোখে কখনোই দেখা হতো না। আজকে যা নিজ-চোখে দেখলাম তা এক বিরাট অভিজ্ঞতা বৈকি। রাতে টিভি খুলে বসলাম। বিভিন্ন চ্যানেলেও আজকের সমাবেশের ওপর অনুষ্ঠান হচ্ছে। বেশির ভাগই আলোচনাধর্মী। কোনো কোনো বক্তা তাদের দাবিকে সমর্থন করে যুক্তি দিচ্ছে, কেউবা বলছে এদেরকে সমর্থন করার কোনো কারণ নেই। কোনো একটি চ্যানেলে দেখলাম বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে এদের উদ্দেশে উপদেশের বাণী প্রচার করা হচ্ছে। কেউ একজন বললো, এ সমাজ থেকে 'সেন্স অব শেম' অর্থাৎ লজ্জাবোধ উঠে গেছে, ওটাকে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। এক বক্তা বললো, সমকামিতা এক ধরনের শারীরিক অসুস্থতা, এদেরকে ধরে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। আরেকজন দ্বিমত পোষণ করে বললেন, এটা কোনো শারীরিক অসুস্থতা নয়। বিষয়টা হচ্ছে মনস্তাত্বিক, এদেরকে সাইকোথেরাপীর মাধ্যমে ভালো করে তুলতে হবে।

পরদিন হামফ্রে-রুমে গিয়ে দেখি, আলোচ্য বিষয় গতকালের সমাবেশ। রুমে ঢুকতেই কিটি এই বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইলো। চোখের সামনে তখনো গত বিকেলের সব অশালীন দৃশ্য। কিটির প্রশ্নের উত্তরে সাত-পাঁচ কোনো-কিছু না-ভেবেই বলে বসলাম— 'তোমাদের দেশে এদেরকে শক্ত হাতে ঠান্ডা করা প্রয়োজন। হয়তো বা ভবিষ্যতে এ-দেশে

www.pathagar.com

একজন হিটলারের প্রয়োজন হতে পারে।' মনে পড়ছে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ছোট বেলায় একবার মাধবীলতার ডালে বাঁধা মৌচাকে ঢিল ছুঁড়েও মৌমাছির হুল এমনকি মেজদার বেত্রাঘাত থেকে বাঁচতে পেরেছিলাম। আজ আর বোধ হয় বাঁচার কেনো পথ নেই। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো মার্সেলা এবং আরো কয়েকজন আমেরিকান সহপাঠিনী। মার্সেলার ঐ-মুখটি এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। চিৎকার করে কি সব বললো। আমার মাথার কিছুই ঢুকলো না। পরে মাথায় হাত দিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ওর চোখে দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ার অবস্থা।

: তোমার হৃদয় এতো কঠিন? আগে কখনো, বুঝতে পারিনি। তুমি এদেরকে মেরে ফেলতে চাইছো?

: ছি ছি! মেরে ফেলার কথা এসলো কোথা থেকে? আমি এদেরকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করার কথা বলছি।

: তুমি ওদের অসুস্থ ভাবছো কেন? এটা ওদের অভ্যাস, যা নিতান্তই ওদের ব্যাক্তিগত। তা-ছাড়া তুমি, একজন হিটলার প্রয়োজন, বলে মন্তব্য করেছো। কিন্তু কেন? তুমি নিশ্চয়ই জানো হিটলার সমকামীদের কিভাবে হত্যা করেছে? তুমি প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক নও।

: শুধু আমি ওদের অসুস্থ বলছি না। এদেশের অনেকেই তা মনে করছে। তাছাড়া হিটলার বলতে আমি এখানে একজন কঠোর নেতৃত্বকে বুঝিয়েছি। প্রকৃত হিটলারের প্রতি তোমার চেয়ে আমার ঘৃণা কোনো অংশে কম নয়। আমি তোমাদের কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করতে চাইনি। তোমাদের ব্যাক্তিগত যৌন-জীবন সম্পর্কে আমার ধারণা থাকার কথা নয়। তাছাড়া তোমার একজন বয়ফ্রেন্ড আছে। তাই আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তোবা আমার মতোই মত পোষণ করবে। ওদের প্রতি আমার যথেষ্ঠ সহানুভূতি আছে। আমি চিকিৎসার মাধ্যমে ওদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পক্ষে। ওদের ঐ জীবন অপছন্দ করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে। এই জন্যে তুমি আমাকে 'গণতান্ত্রিক নও' বলতে পারো না। এই দেশে অনেক লোকই আছে যারা ওদের জীবন এবং ওদের দাবি সমর্থন করে না।

: তুমি আমাকে ভূল বুঝোনা। আমার ব্যক্তিগত যৌন-অভ্যাসটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। তাছাড়া এ দেশে অনেক লোকই আছে যারা যৌন-জীবন যাপন করে, অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয় ধরনের সংগীর সঙ্গেই তারা সমান আনন্দ লাভ করে।

বুঝলাম তৃতীয় বিশ্বের আমরা অনেক কিছু, যা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয় তা, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বন্ধ করতে চাই। এ আমাদের জন্মগত সংস্কার। কিন্তু পাশ্চাত্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য অনেক। ব্যক্তিগত বিষয়ের ওপর শক্তি প্রয়োগের কোনো অবকাশ এ দেশে নেই, প্রয়োজনও বোধ হয় নেই। তবুও আমার পক্ষে বলার মতো কিছু কথা বোধ হয় তখনো বাকি ছিলো। বলতে দ্বিধা করলাম না।

www.pathagar.com

: দেখো, আমাদের অঞ্চলের কোনো একজন ব্যক্তি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে যতো উদারই হোক-না-কেন যৌন-আচরণের দিক থেকে তাকে যথেষ্ট রক্ষণশীল থেকে যেতে হয়। এটা হয়তোবা আমাদের জন্মগত সংস্কার। তাছাড়া আমাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক কাঠামোতেও সমকামকে সমর্থন করা হয় না। তার মানে আমাদের দেশে-যে একেবারে সমকামিতা নেই, তা জোর দিয়ে বলছি না। হয়তোবা আমাদের দেশেও এরা আছে, তবে সংখ্যায় কম এবং লুক্কায়িত। গত বৎসর একজন বাংলাদেশী ছাত্র আরেকজন আমেরিকান পুরুষ-ছাত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে বলে আমি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকায় দেখেছি। তোমাদের দেশে এরা অতি মাত্রায় বেড়ে উঠলে আমাদের দেশের ওরাও বৈধতা চইবে, যা আমাদের দেশের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তা না-দিতে পারলে তোমাদের দেশের সগোত্রীয়রা বলবে আমাদের দেশে মানবাধিকার নেই। এখানেই আমার ভয় এবং আপত্তি। আশা করি তুমি আমার যুক্তিটা বুঝতে পেরেছো।

একসঙ্গে এতোগুলো সহপাঠিনীকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ঈগল' পত্রিকায় দেখলাম গে এবং লেসবিয়ানদের আন্দোলন সমর্থন ক'রে বিরাট একটা নিবন্ধ বের হয়েছে। এ দেশের জনমতও কি তা হলে ওদের আন্দোলন পুরোপুরি সমর্থন করছে? তবে ওদের দাবি মেনে নিতে অসুবিধাটা কোথায়? বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেছে। একদিন এ বিষয়ে কথা হচ্ছিলো আমার মেনটর অর্থাৎ পরামর্শদাতা-প্রফেসর জন রিচার্ডসন-এর সঙ্গে। রিচার্ডসন আমাকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করলো—

: তুমি তো এদেশে আছো প্রায় এক বছর ধরে। এ দেশের টিভি, সিনেমা, ইত্যাদি প্রচার-মাধ্যমে যে-মার্কিনী জীবনধারা দেখানো হয় তার সঙ্গে কি বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাও ?

তাই তো এই বিষয়টা খুব গুরুত্ব দিয়ে কখনো ভাবিনি। আমাদের দেশের 'চলচ্চিত্রেওতো বাস্তব জীবনের কোনো প্রতিফলন নেই। আমার না-বোধক উত্তরের প্রেক্ষিতে রিচার্ডসনের সহজ উক্তি-

: কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশ দেখে বাইশ কোটি আমেরিকানের জীবন-ধারা সম্পর্কে কোনো ধারণা করা কি ঠিক হবে?

: তুমি কি ওদের দাবি সমর্থন করো ?

: আমি কি সমর্থন করি-না-করি সেটা বড় কথা নয়। প্রত্যেকেরই যার যার ইচ্ছামতো জীবন-ব্যবস্থা বেছে নেবার স্বাধীনতা রয়েছে। সেই রকম ব্যবস্থা অন্য কেউ বেছে নেবে কিনা বা সমর্থন করবে কিনা তা নির্ভর করছে যে গ্রহণ করবে তার রুচি এবং ইচ্ছার ওপর। এখানে জোর-জবরদস্তির কোনো অবকাশ নেই।

এই একটি বিষয়ে স্পষ্ট 'মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও মার্সেলার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে এতটুকুও ফাটল ধরেনি।' কয়েকদিন আগেও ভিয়েতনাম থেকে লেখা ওর চিঠি পেয়েছি।

www.pathagar.com

কোনো কোনো মানুষ আছে যাদের কথা পরিচিত জনের চিরদিন মনে থাকে। রিচার্ডসন হচ্ছে এ জাতীয় একজন মানুষ। ওর মুখটি এখনো আমার মনে আছে, হয়তোবা থাকবেও চিরদিন। রিচার্ডসন, মানে জন রিচার্ডসন জুনিয়র, ওয়াশিংটন ডিসি-র দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস-এর অধ্যাপক এবং আমার মেনটর অর্থাৎ পরামর্শদাতা, গাইড। ওঁর স্ত্রী এমিলি রিচার্ডসন ছিলো হামফ্রে-ফেলোশীপ প্রোগ্রাম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন-এর সহকারী পরিচালক। কাজেই কর্মসূত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়েছিলো। প্রথম পরিচয়ে আমি প্রফেসর বলে সম্বোধন করাতে ওর প্রবল আপত্তি। ওকে 'জন' বলে ডাকার জন্যে অনুরোধ করলো। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তাছাড়া আমারই একজন অধ্যাপক, তাই শুধু নাম ধরে ডাকবোই বা কি করে? আমার একটু ইতস্তত ভাব দেখে বললো, 'তোমাদের অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এ এক সমস্যা। স্যার, প্রফেসর কী-সব সম্বোধন করতে চাও তোমরা! যা-হোক তোমার পার্শ্ববর্তী দেশ কলকাতার শিনজিনি আমাকে রিচার্ডসন বলে ডাকে। তুমিও আমাকে ঐ নামে ডেকো। সেই থেকে ওকে রিচার্ডসন বলেই ডাকতাম, অনেক সময় ওর সাহচর্যে কাটিয়েছি, ওর পয়সায় লাঞ্চ খেয়েছি অসংখ্যবার, কখনো পয়সা দিতে গেলেই একটা উত্তর 'এখানে না, বাংলাদেশে গেলে শোধ করবে'।

আমার স্ত্রী এবং মেয়ে ওয়াশিংটন ডিসি আসছে। এ নিয়ে উৎকণ্ঠার সীমা নেই ওঁর। এয়ারপোর্টে কার সঙ্গে যাচ্ছি? ওঁর যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? বাড়ীতে কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে কি না, ইত্যাদি নানান প্রশ্নের মধ্যেই ওঁর আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়েছিলাম। বিশেষ প্রয়োজনে কিছুদিন পরই হঠাৎ করে আমার স্ত্রীকে দেশে ফিরতে হলো। স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি দিন মানসিকভাবে খারাপ কেটেছে। এটা রিচার্ডসনের দৃষ্টি এঁড়িয়ে যায়নি। হঠাৎ করেই এক সকালে টেলিফোন: আগামীকাল ওঁর বাড়িতে যেতে হবে। গিয়ে দেখি এক বিরাট ব্যাপার। ওঁর তাবৎ ছাত্র-ছাত্রীদের দাওয়াত করে এনেছে ঐ সন্ধ্যায়। উদ্দেশ্য আমার মন ভালো করে দেওয়া। আমি ছাড়া বিষয়টা বোধ হয় কারো জানতে বাকি নেই। কারণটা জানার পর একটু বিব্রত বোধ করলাম সত্যি, কিন্তু সেই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের মধ্যমণি যেন আমি।

হামফ্রে-ফেলোদের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। দশজন ফেলোর জন্যে দশজন মেনটর। প্রথমে মেনটর তাঁর ছাত্র কিম্বা ছাত্রী সম্পর্কে কয়েক মিনিট বলবেন, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ঐ ফেলোর হাতে সনদপত্র তুলে দেবেন। কয়েকজনের পর আমার পালা। পায়ে আঘাত থাকা সত্ত্বেও ক্রাচে ভর দিয়ে এসেছেন রিচার্ডসন। আমার সম্পর্কে বলছে তো বলছেই। নিজের সম্পর্কে এরূপ ভালো কথা আমি কোনোদিন শুনিনি। মানুষের ছোট একটা অভ্যাস বা তুচ্ছ একটা ঘটনা-কে এতো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারে রিচার্ডসন!

আমার প্রোগ্রাম শেষ। ফেয়ারওয়েল-লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছে রিচার্ডসন স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে। অত্যন্ত ঘরোয়া একটি দুপুর। খাবার পর নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

www.pathagar.com

এক সময় রিচার্ডসন আমাদের বিয়ের স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি ওঁকে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বিয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছিলাম। পারিবারিক বায়োডাটা বিনিময় করার বিষয়টি ওকে খুব আকর্ষণ করলো। এক পর্যায়ে রিচার্ডসন বললো—

: তোমাদের জানা আছে কিনা যে, বিয়ের ব্যাপারে বনেদী পরিবারের কদর কিন্তু এদেশেও আছে। বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে। এই ডিসি এলাকার কথাই ধরো না কেন। এখানে ব্লু-বুক ফ্যামিলি বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এখানকার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর তালিকা রয়েছে ঐ ব্লু-বুকে। এমিলিও ব্লু-বুক পরিবারের মেয়ে। নতুন প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী ওয়াশিংটনে এসেই প্রথম খোঁজ করেন ব্লু-বুকের। ব্লু-বুক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান সকলেই। ডেবিউটান্ট শব্দটির সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। উচ্চবংশীয় কোনো মেয়ে যখন যৌবন প্রাপ্ত হয় তখন তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অনুষ্ঠান করা হয়। সব তরুণদের নিমন্ত্রণ করা হয় সেখানে। সমাজকে জানানো হয় যে, আমাদের মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছে। উপযুক্ত পাত্ররা তার পাণিপ্রার্থনা করতে পারে, তাকে ডেটিং এর জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। ঐ ডেবিউটান্ট অনুষ্ঠানে কাকে দাওয়াত করা হবে, এই নিয়ে প্রায়ই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এখানে। ব্লু-বুক পরিবারের মেয়েদের ঐ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র ব্লু-বুক পরিবারের ছেলেদেরই নিমন্ত্রণ পাওয়ার কথা। আজকাল বাইরের ধনী পরিবারের অনেককেও দাওয়াত করে থাকে কেউ কেউ। এই নিয়ে কম কথা-বার্তা হয় না পরিবারগুলো মধ্যে। এ-ব্যাপারে তোমার আগ্রহ থাকলে এমিলির কাছ থেকে আরো জেনে নিও।

রিচার্ডসনের কাছ থেকে ঐ দেশের সমাজ ব্যবস্থার একটা দিক সম্পর্কে নতুন ধারণা পেলাম। মেনিয়াপোলিসে শেষবার দেখা হওয়ার সময় এই বিষয়ে এমিলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও যেন একটু লজ্জা পেলো সব শুনে। 'জন তোমাকে বলছে এই সব?' তারপর প্রসংগ বদল করে অন্য কথায় চলে গেল। এই প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট স্মৃতি মনে পড়ছে। ক্রিস্টমাসের কয়েকদিন আগে হামফ্রে-রুমে বসে আছি। প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ড. স্টীভ অরনল্ড রুমে ঢুকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, ক্রিস্টমাসের ছুটিতে ওঁর বাবার বাড়ি ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবেন। আমার সঙ্গে হাত মেলানোর সময় বললেন—

: তোমরা ভাবো আমাদের কোনো পরিবার নেই, এটা ঠিক না। এ দেশে পারিবারিক কাঠামো অনেকটা শিথিল হয়েছে সত্যি, কিন্তু পরিবারের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগ নেই এরকম লোক তুমি খুব কমই পাবে।

দেশে ফেরার দিন রিচার্ডসনই ওঁর গাড়িতে করে আমাকে ওয়াশিংটন ডিসি-র ডাল্লাস এয়ারপোর্টে সী-অফ করতে এলেন। বিদায় নেবার আগে মেনটর হিসাবে ওঁর শেষ পরামর্শ—

: গত একটা বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে যে-সম্পর্ক গড়ে তুলেছো তা নষ্ট হতে দিয়ো না। ওটা রক্ষা করে যেয়ো। গড়ে-ওঠা সম্পর্ক রিচার্ডসনও নষ্ট

www.pathagar.com

করেননি। গত সপ্তাহেও ওঁর চিঠি পেয়েছি। শ্রীলঙ্কার ওপর ওঁর বইটার লেখা প্রায় শেষ করে এনেছেন।

Economic Development and Social Change নামে একটি কোর্স পড়াতেন অধ্যাপক জেমস উইভার। প্রতিটি ক্লাসেই উন্নয়নশীল দেশের প্রসঙ্গ এসে পড়তো। এই বিষয়ে পূর্বের পড়াশোনা আর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ক্লাশের আলোচনায় বেশ অংশগ্রহণ করতে পারতাম। শেষের দিকে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, কেউ প্রশ্ন করলে প্রফেসর উত্তরে বলতেন আমার নাম। বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়াতে হতো। একদিন ক্লাশ হচ্ছিলো আমদানি-বিকল্প শিল্পায়ন-নীতির যথার্থতা নিয়ে। নব্বই-এর দশক হচ্ছে খোলা বাজার অর্থনীতির দশক। আমদানি ঠেকিয়ে নিজ দেশে শিল্পগড়ার পুরনো কৌশলকে সমালোচনা করছিলেন প্রফেসর উইভার। তার সঙ্গে বর্তমানে বোধ হয় দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। তবুও নিরুত্তাপ ক্লাশে একটু আলোচনা তোলার জন্যে পুরনো একটি মন্তব্য করলাম 'শিল্পায়নের দৌড়ে তোমাদের সব দেশ ঐতিহাসিক কারণে অনেক এগিয়ে আছে। আমরা যদি সব দরজা পুরোপরি খুলে রাখি তবে তোমাদের সবল পণ্য আমাদের দুর্বল পণ্যগুলোকে কি বাজার থেকে বের করে দেবে না ? এ অবস্থায় কি করি বলতো?' প্রশ্নটির উত্তর আমার জানা। তবুও ক্লাশটিকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্যেই প্রশ্নটি করা। উইভারের কোনোরূপ মন্তব্য করার আগেই ক্রীস্ট নামের এক ছোকরা বলে উঠলো 'বি কলোনিয়ালাইজড এগেইন' অর্থাৎ আবার তোমরা কোনো উন্নত দেশের উপনিবেশ হয়ে যাও। তোমাদের সকল সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র উপায়। লম্বা ছিপছিপে গড়নের ক্রীস্ট সব সময়ই একটু সিরিয়াস ধরনের। তবুও কেন যেন মনে হলো ঠাট্টা করছে কিম্বা কোনো-কিছু না-ভেবেই এমন আপত্তিকর একটা মন্তব্য করেছে। তাই বুঝেও না বোঝার ভান করে ওর বক্তব্যটা পুনরায় বলতে অনুরোধ করলাম। এবার আরেকটু স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে ক্রীস্ট তার পুরনো মন্তব্যই পুনঃ উচ্চারণ করলো। দ্বিতীয়বার ওর মন্তব্য শুনে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না। সম্ভবত দু'শ বৎসর ধরে শোষিত হওয়ার ক্ষোভ আর বেদনা মনের নিভৃতে চাপা ছিলো। অবচেতন ভাবেই ঝটিকা-গতিতে উঠে দাঁড়ালাম। ওর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কী-সব যুক্তি দেখিয়েছিলাম অতো-কিছু মনে নেই। তবে মনে আছে ওকে অকাট মুর্খ বলে গালি দিয়ে বলেছিলাম 'অপেক্ষা করো, আমাদেরও সময় আসছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তার লক্ষণ শুরু হয়েছে মাত্র।' ক্লাশ থেকে বের হবার পর ঘানার ইমা ও ইথিওপিয়ার টুডু-সহ অনেকেই আমার বক্তব্যের জন্যে ধন্যবাদ জানালো। সেদিনের ক্লাশে অনুপস্থিত জর্ডানের পাসপোর্টধারী প্যালেস্টাইনের ওয়ালিদ সব শুনে বললো 'আমি উপস্থিত থাকলে বদমাইশটাকে উচিত শিক্ষা দিতাম। একটা স্বাধীন দেশকে ও উপনিবেশ হওয়ার জন্যে বলেছে। শুধুমাত্র একটা নয়, তৃতীয় বিশ্বের সবগুলো দেশকেই ও অপমান করেছে। জাতিসংঘের নীতিমালা ভঙ্গ করেছে। ওর বিরুদ্ধে মামলা করতে হবে। নিদেনপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ করবো।'

www.pathagar.com

ওয়ালিদকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। সেদিন হামফ্রে-রুমে বিষয়টা নিয়ে মতবিনিময় হলো অনেকক্ষণ। একটা বিষয়ে আমরা অন্তত একমত, এদেশের অনেক নাগরিক, এমনকি ছাত্র-ছাত্রীও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। অনেকেরই অনেক ধারণা সম্পূর্ণ ভুল কিম্বা অসম্পূর্ণ। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-থাকা-অবস্থায় শুনেছিলাম, এক মার্কিন ছাত্রী একজন আরব ছাত্রের কাছে জানতে চেয়েছিলো, তার চারজন স্ত্রীই এক বাড়িতে থাকেন কিনা। ঐ ছাত্রীর জানামতে প্রতিটি মুসলমানেরই চারটি করে স্ত্রী থাকার কথা। আটলান্টিক সিটি থেকে নিউইয়র্কে ফেরার পথে গ্রেহাউন্ড কোম্পানির বাসে পাশের সিটে-বসা সহযাত্রী প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার অন্যতম প্রশ্ন ছিলো, 'ব্রিটিশ রাজশক্তি কি উপমহাদেশের লোকদের সভ্য করতে পেরেছে?' এরূপ প্রশ্নকে মনীষী নীরদচন্দ্র চৌধুরী কিভাবে নিতেন জানি না, উপমহাদেশের একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমি সংগত কারণেই খুশি হতে পারিনি। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার ইতিহাসে সমৃদ্ধ একটি ভূখন্ডকে কয়েকশ বছরের নব্য-সভ্য একটা জাতি কিভাবে সভ্যতার জ্ঞান দেবে? মন্তব্যটা আমার নয়। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাসকাডিলা ডর্মের একজন সামান্য কর্মচারী বিল-এর। বিলের মন্তব্যটাই ছুঁড়ে মেরেছিলাম সহযাত্রী ভদ্রমহিলাকে। প্রসঙ্গ বদল করে তিনি আলাপ জুড়ে দিয়েছিলেন সেদিনের আবহাওয়ার ওপর। সবচেয়ে মজার গল্প শুনেছিলাম গ্রীসের হামফ্রে-ফেলো থিওডোরার কাছ থেকে। ওর ক্লাশের শ্রীলঙ্কার এক মেয়ের কাছে একজন আমেরিকান ছাত্রী নাকি জানতে চেয়েছিলো, শ্রীলংকায় কি ঘরবাড়ি আছে, নাকি ওরা গাছের ডালে বাস করে (!!!)। তবে সব আমেরিকানের সাধারণ জ্ঞানের বহর এই ধরনের ভেবে তাদেরকে মূল্যায়ণ করার মতো বোকামি বোধ হয় আর কিছুতে হবে না। কোনো কোনো আমেরিকান তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে এতোটা জ্ঞান রাখে যে, আমরা নিজেরাও তা রাখি না। 'দি আমেরিকান ইউনির্ভাসিটি'-তে আমার প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ছিলেন ড. স্টীভ আরনল্ড। ড. স্টীভ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগামের একজন অধ্যাপক। ঐ প্রোগ্রামে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক-এর ওপর দু'টি থিসিস গ্রুপ রয়েছে। যদিও গ্রামীণ ব্যাংক কিম্বা ব্র্যাকে-এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই তবুও ড. স্টীভ দু'বার দু'দল ছাত্র-ছাত্রীকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন আলাপ করার জন্যে। ওদের সাথে আলাপ করতে গিয়ে আমিই লজ্জিত হয়েছি নিজের কাছে। শুধুমাত্র ঐ দু'টি প্রতিষ্ঠান নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় সম্পর্কেও কারো কারো জ্ঞানের গভীরতা দেখে অবাক না-হয়ে পারিনি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি, সাতচল্লিশ সাল থেকে আজ পর্যন্ত নানারূপ রাজনৈতিক বিষয়, এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন ও মন্তব্যে আমি কখনো বিস্মিত, কখনো পুলকিত, কখনোবা শিহরিত হয়েছি। পরে আমার কাছে মনে হয়েছে সাধারণ আমেরিকানরা নিজের কাজ খুব ভালো বোঝে, নিজের জগতের বাইরে অন্য বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে যায় না। আমরা নিজের পেশাকে অবহেলা করে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানের সন্ধানে

www.pathagar.com

যে-সময় ব্যয় করে তৃপ্তি লাভ করি ওরা সেই সময়টাকে নিজেদের পেশার পেছনেই বরাদ্দ করে বস্তুগত উন্নতি লাভে সচেষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি ছোট্ট স্মৃতি মনে পড়ছে। ওয়াশিংটন ডিসি-র স্টেট ডিপার্টমেন্টে কথা হচ্ছিলো USAID এর বাংলাদেশ-সংক্রান্ত বিষয়ের ডেস্ক অফিসের ডেভিড ফ্রেডরিক-এর সঙ্গে। পেশাগত কথাবার্তা বলে চলে আসার সময় ওভারকোটটি ওঁর কক্ষে হ্যাংগারে রেখেই চলে আসছিলাম, ভুলে। ফ্রেডরিক-এর ডাকে ফিরে তাকালাম। হ্যাংগার থেকে কোটটি নামাতে নামাতে ফ্রেডরিক বলছে –

: আপনার কোটটি ফেলে যাচ্ছিলেন। এই কোটটি নিশ্চয়ই বঙ্গবাজার থেকে কেনা?

: হ্যাঁ, কিন্তু বঙ্গবাজার আপনি চেনেন কীভাবে?

ভদ্র, অমায়িক অথচ নিজ কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান ফ্রেডরিক একটু রসিকতার চেষ্টা করলেন যেন—

: ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি এখানকার বাংলাদেশ ডেস্ক-এর অফিসার? শুধুমাত্র বংগভবন চিনলে চলবে কেন? বঙ্গবাজারকেও চিনতে হবে বইকি। এই বৎসরেও আমি বঙ্গবাজার থেকে নিজের এবং আমার ছেলেদের পোশাক কিনেছি। এতো স্বল্প মুল্যে এমন ভালো জিনিস আর কোথায় পাওয়া যাবে?

শুধু বংগভবন নয়, প্রয়োজনে বঙ্গবাজারও ওরা ভালোভাবে চেনে। যা বলছিলাম, শেষ পর্যন্ত অভিযোগ দাখিল করার প্রস্তাব থেকে ওয়ালিদকে সরিয়ে আনা গেল। তবে ওর শর্ত: আগামী ক্লাশে ক্রীস্টকে নিতে হবে একচোট। আমি যেন পড়াশুনা করে প্রস্তুত হয়ে থাকি।

পরের ক্লাশে। নির্ধারিত বিষয় বাদ দিয়ে প্রফেসর উইভার শুরু করলেন ডিপেনডেন্সী থিওরী, কলোনিয়ালিজম, নিও কলোনিয়ালিজম, অর্থাৎ পরনির্ভরতা, উপনিবেশবাদ, এবং নয়া উপনিবেশবাদ-তত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা। এমনিতে প্রফেসর উইভার সক্রেটিক স্টাইলে, অর্থাৎ আলোচনার মাধ্যমে পড়াতেন। কিন্তু ঐ-দিন পুরোটা সময় ধরে একটানা তিনিই বললেন। আমি আগের ক্লাশে এইসব বিষয়ে এমন অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সম্ভবত, কিছুই বলতে পারিনি, কিছুটা উত্তেজনায় বাকিটা অজ্ঞানতার কারণে। কিন্তু প্রফেসর উইভার আমার কথাগুলোকেই যেন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন আজ। ক্লাশের শেষে একবার আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন প্রফেসর উইভার। আমি কিছুই বলতে পারলাম না, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। এমন মহৎ হৃদয়ের শিক্ষককে কি ভোলা যায়?

আমার ধারণা পৃথিবীর সব দেশেই বিশাল দেহের অধিকারী মানুষরা হয় ভোজন বিলাসী এবং রসিক জন। হৃদয়টি তাদের যেমন প্রশস্ত হয় মস্তিস্কের অতি প্রয়োজনীয় পদার্থটি সেই তুলনায় বিশাল হয় কিনা ঠিক করে বলা মুশকিল। এ দেশে বিশাল দেহধারী দু'এক জনের সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তাদের একজন Paul Forte। ভদ্রলোক ভার্জিনিয়ার কোনো এক কাউন্টি গভঃ-এর রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা। হামফ্রে-ফেলেদের ওয়াশিংটন কনফারেন্সের সময় এক দিনের জন্যে কোনো একটা অফিসে গিয়ে ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রায়োগিক ধারণা নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। ওরা এটাকে বলে শ্যাডোয়িং প্রোগ্রাম।

www.pathagar.com

মূলত এমিলি রিচার্ডসনের করা এই শ্যাডোয়িং প্রোগ্রামের সূত্রেই Forte-এর সঙ্গে আমার পরিচয়। দেহের বিশালত্বের কারণে চেহারা দেখে ওর বয়স অনুমান করা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। ভদ্রতার কারণে জিজ্ঞাসা করাও যায় না, আমার জিজ্ঞাসা করার কোনোরকম প্রয়োজনও ছিলো না। কিন্তু পরিচয়ের প্রথম পর্বেই ভদ্রলোক রসিকতা করলেন, আমার নামের শেষে Forte থাকলেও বয়স কিন্তু এখনো Forty হয়নি, মাত্র ঊনচল্লিশ। সারা সকাল কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানারূপ রসিকতা: 'আমার অফিসের তাবৎ সুন্দরীদের দেখাবো তোমাকে'। এই বলে নানা বাহানায় ওর বিভাগে কর্মরত মহিলা সহকর্মিদের ডেকে ডেকে আনলেন আমার সামনে। ওরা যাওয়ার পর একেক জন সম্পর্কে ছাড়লেন একেক রকম রসময় মন্তব্য শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ থেকে শুরু করে কোনো-কিছুই আর আটকায় না ওঁর মুখে। দুপুরে লাঞ্চের সময় রেস্তোরাঁয় ঢুকে বুফে লাঞ্চ। একাই বোধ হয় পাচঁ জনের খাবার খেলেন। নীরস আমি সারা সকাল পার করে একটা রসিকতার সুযোগ পেলাম যেন: 'তোমার মতো কাস্টমার বেশি হলে আর কিছুদিন পর ওরা বুফে লাঞ্চের ব্যবস্থা তুলে দেবে।' আমার মন্তব্যে হো হো করে হেসে বললেন 'তোমার মতো কাস্টমারেরও অভাব নেই এ দেশে।'

আর একবার ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো থেকে এপকট সেন্টার দেখে ফিরছি। ট্রেনের ডাইনিং-কারে আরেক পল ফরটির সঙ্গে দেখা। ওর নামটা এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি না। তবে কথা বলার ভঙ্গি, হাবভাব, রসিকতা—সবই ফরটির সঙ্গে মিলে যাচ্ছিলো। এক সময় কথা প্রসঙ্গে দেহের উচ্চতা আর ওজন নিয়ে আলাপ হচ্ছিলো।

: তুমি জানো আমাদের দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফ্ট ছিলো ছ'ফুট, অর ওজন মাত্র তিনশ চল্লিশ পাউন্ড। তবে তোমার মতোও একজন ছিলেন, জেসম মেডিসিন। উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। আর ওজন একশ পাউন্ড মাত্র।

স্বল্প পরিচিত ভদ্রলোকের রসিকতায় না-হেসে পারলাম না। পরবর্তীকালে এই প্রেসিডেন্ট হাওয়ার্ড টাফট সম্পর্কে মজার সব গল্প পড়েছিলাম আমার মেনটর রিচার্ডসন ও এমিলি রিচার্ডসনের উপহার-দেওয়া একটা বইতে। বহু পরিশ্রম, ব্যায়াম, ডায়েটিং, ইত্যাদির পর টাফট তাঁর ওজন তিনশ চল্লিশ পাউন্ড থেকে তিনশ পাউন্ডে কমিয়ে এনোছিলেন। তিনি তখন ফিলিপাইনের গভর্ণর জেনারেল পদে কর্মরত। কয়েকদিন যাবত শরীর ভালো যাচ্ছিলো না। ওয়াশিংটন অফিস থেকে সেক্রেটারি মিঃ রুট ক্যাবল করে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে চাইলেন। টাফট উত্তর পাঠালেন, তিনি ভালো আছেন এবং এই মাত্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে পঁচিশ মাইল ঘুরে এলেন। রুট পুনরায় ক্যাবল পাঠিয়ে রসিকতা করলেন, 'ঘোড়াটার কি অবস্থা? বেঁচে আছে তো?' টাফট নিজেও কম রসিক ছিলেন না। আইন বিশারদ টাফটকে একবার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Chair of Law পদ গ্রহণের জন্যে প্রস্তাব দেওয়া হলো। 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবটি a Sofa of Law এর জন্য হলে বোধ হয় আমার জন্যে আরো প্রাসঙ্গিক হতো' এই কথা বলে তিনি প্রস্তাবটি মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করলেন।

www.pathagar.com

মুভিং ফায়ার ইন ওকলাহোমা: দি ট্রেইল অব টিয়ারস্?

নীতি নির্ধারণকারী, পরিকল্পনাবিদ কিংবা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সৈনিকদের কাছে ওয়াশিংটন ডিসি-র 'এইচ' স্ট্রীটের গুরুত্বই আলাদা। ১৮১৮ এইচ স্ট্রীটে রয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দফতর। এর উল্টো পাশেই রয়েছে আইএমএফ অর্থাৎ আন্তজাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রধান কার্যালয়। আশেপাশের একাধিক দালানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওই দু'টি আন্তার্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অফিস। এইসব ভবনের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষেই বিশ্ব অর্থনীতি এবং উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে নানারূপ নীতি নির্ধারিত হচ্ছে, গৃহীত হচ্ছে নানারূপ কার্যকরী সিদ্ধান্ত। ওই সব নীতি কিংবা সিদ্ধান্তের ধনাত্মক প্রতিক্রিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের অভাবী মানুষ কখনো একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, কখনোবা এগুলোর ঋণাত্মক চাপে তাদের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ।

হামফ্রে-ফেলো হিসেবে আমি তখন বিশ্ব ব্যাংকের Country Operation, Industry and Finance-এর Asia Region অফিসে কাজ করি। ১৮১৮ এইচ স্ট্রীটের ডি বিল্ডিং-এ বসি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্ব ব্যাংকের ড. মাহ্মুদ (আক্তার), ড. আহমেদ আহসান, জাহিদ কিম্বা আইএমএফ এর ড. তারেক অথবা ড. মোশারফ (মুনির) ওদের সাথে মত বিনিময় করি। কখনো কখনো লাঞ্চের সময় দেখা হয়ে যায় ড. সাদেক, ড. হাবিব মনসুর, ড. মইনুল-ওঁদের সাথে। এক সময় এঁরা সকলেই আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র ছিলো। দেশের অর্থনীতির হাল হকিকত, রাজনীতি, আমলাতন্ত্রের অবস্থা, দেশের মেধাবী ছেলেদের দেশত্যাগ সবকিছুই আলোচনায় স্থান পায়। বর্তমানে প্রায় চল্লিশজন বাংলাদেশী পেশাজীবি বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এ কাজ করছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে ওরা একটা অবদান রাখলেও দেশ-যে ওদের মেধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উন্নত, নিশ্চিত জীবনের হাতছানিকে কজনইবা উপেক্ষা করতে পারে? তবুও বিশ্ব ব্যাংকের বিভিন্ন কক্ষে কিম্বা ক্যাফেটেরিয়ায় যখন কোন বাংলাদেশীর সাথে দেখা হয়ে যেতো তখন ভালই লাগতো। বুঝতাম বিশ্ব-পরিমণ্ডলে আমরাও কিছু দিচ্ছি, শুধুমাত্র নিচ্ছি না। ধনসম্পদ দিয়ে না পারলেও মেধা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করছি।

www.pathagar.com

ডি ভবন-এর উল্টো পাশে আইএমএফ-এর প্রধান কার্যালয়ের বাইরে, এক কোণায় মাটির নীচে একটি ভবনে আইএমএফ ভিজিটরস্ রুম। হঠাৎ চোখে পড়লো Moving Fire is Oklahoma নামে একটি প্রদর্শনী হচ্ছে ওখানে। বিভিন্ন ছবি আর পেইন্টিং-এর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে নেটিভ ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন স্মৃতি। ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী দেখছিলাম। নেটিভ ইন্ডিয়ানদের নিয়ে এ-জাতীয় ছবি, স্ট্যাচু, ইত্যাদি আগেও দেখেছি স্মীথ সোনিয়ান কমপ্লেক্সের আমেরিকান হিস্ট্রি মিউজিয়ামে। খুব একটা ভালো লাগছিলো না।

: কিছুই হয়নি। এটা ইন্ডিয়ানদের প্রকৃত ইতিহাস নয়।

ঘাড়ের কাছে বিড় বিড় করা উক্তি-কয়টি কানে এসে বাজলো। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক বৃদ্ধা তাচ্ছিলের সঙ্গে প্রদর্শনীর ছবিগুলো দেখছেন। পোষাক-পরিচ্ছেদ আধুনিক। কিন্তু চেহারার গড়নে কিছুটা ইন্ডিয়ান ছাপ স্পষ্ট চোখে পড়ে। ভনিতা না করেই প্রশ্ন করলাম—

: প্রকৃত ইতিহাস কি?

: তুমি যদি প্রকৃত ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে জানতে চাও তবে অনেক বই পাবে। আর ওকলাহোমার এই বিষয়টি জানতে চাইলে দেশের ইতিহাসের The Trail of Tears পর্বটাই পড়ে দেখো না!

আলাপ জমতে সময় লাগলো না বৃদ্ধার সঙ্গে। নাম যতোদূর মনে পড়ে Lice Woo ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত এই বৃদ্ধা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। ওয়াশিংটন ডিসি-তেই থাকেন। মূলত Lice Woo-এর সঙ্গে কয়েক মিনিটের আলাপই ইন্ডিয়ানদের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলে।

আসলে আমেরিকান নেটিভ ইন্ডিয়ানদের ইতহাস দুঃখ আর বিষাদে ভারাক্রান্ত। ইন্ডিয়ানরাই ছিলো উত্তর অমেরিকা তথা সমগ্র আমেরিকার মূল বাসিন্দা। এই জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা প্রায় ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে শেষ বরফ যুগে সাইবেরিয়া থেকে বেরিং প্রণালী পার হয়ে সর্বপ্রথম আলাস্কায় এসেছিলো বলে নৃতাত্বিকরা মনে করেন। সময়ের সুদীর্ঘ পরিসরে ওরা বিভিন্ন জন ও ভাষাগোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো সমগ্র উত্তর আমেরিকায়। কলম্বাসের পূর্বেও এইসব মানুষেরা অন্তত একবার মূল ভূ-খণ্ডের মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলো বলে ধারণা করা হয়। আনুমানিক এক হাজার খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ-এর আইসল্যান্ড দেশীয় একদল মানুষ, যারা ভাইকিং নামে পরিচিতি, লিয়েফ এরিকসন নামের একজন দুঃসাহসী নাবিকের নেতৃত্বে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকার উত্তর উপকূলে নোঙর ফেলেছিলো। কিন্তু ভাইকিংরা মূল ভ-খন্ডের সাথে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং পৃথক সত্তা নিয়ে স্থায়ী কোন আবাস গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। এরিকসন এবং তার সাথীদের পরিণতি কি হয়েছিলো আজ তা গবেষণার বিষয়। ভাইকিং অভিযানের পায় পাঁচশ বছর পর কলম্বাসের নেতৃত্বে আরেকদল ইউরোপীয় পথ ভুলে আমেরিকায় নোঙর ফেলে। পর্তূগীজ রানী ইসাবেলার আর্থিক সহায়তা লাভ করে চার হাজার মাইল নৌপথ পাড়ি দিয়ে ইতালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারত বর্ষে পৌঁছার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা শুরু করেছিলো। কলম্বাস ইউরোপ হতে পশ্চিমে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষে না পৌঁছে প্রথমে পৌঁছে গেলেন ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত বাহামা দ্বীপপুঞ্জে। ভুল করে কলম্বাস প্রথমে এটাকে ভারতবর্ষ ভেবেছিলেন এবং এখানকার মানুষকে ডেকেছিলেন Los Indious অর্থাৎ Indians বলে।

পৃথিবীর আদিম জনগোষ্ঠী যেখানেই তথাকথিত সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, সেখানেই তাদের কে হতে হয়েছে সভ্যতার বলি। এই ভূ-খন্ডেও আদিম ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠিকে তাদের স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখার জন্যে অনবরত সংগ্রাম করতে হয়েছে সভ্য জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনবরত ধ্বংসযজ্ঞ এই আদিম জনগোষ্ঠীকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। বর্তমানে প্রায় পনের লাখ আদিম ইন্ডিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের সম্মান নিয়ে বসবাস করছে। এদের অর্ধেক অংশ অন্যান্য আমেরিকানদের ন্যায় দেশের বিভিন্ন নগরে বন্দরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বাকি অর্ধেক আছে ওদের জন্যে ফেডারেল সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত রিজার্ভেশনে। বর্তমানে এই জাতীয় রিজার্ভেশনের সংখ্যা প্রায় তিনশত। অধিকাংশই মিসিসিপি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। রিজার্ভেশনগুলোর মূল আয়তন একুশ মিলিয়ন হেক্টর যা-নাকি যুক্তরাষ্ট্রের মোট জমির আড়াই শতাংশ।

কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন আদিম ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা দশ লাখ ছিলো বলে অনুমান করা হয়। ভাষার সংখ্যা ছিলো প্রায় তিনশ। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং অসুস্থতার ফলে ১৯২০ সালে ওদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র তিন লাখ পঞ্চাশ হাজারে। Pueblo, Apache, Iroquis, Shinnecock, Cherokee, Sioux, Hopi, ইত্যাদি ছিলো ওদের প্রধান প্রধান গোত্র। কৃষি, পশুশিকার, মৎসশিকার, ইত্যাদি ছিলো বিভিন্ন গোত্রের পেশা। ইন্ডিয়ানরাই ইউরোপীয়দেরকে কর্ন, টমেটো, আলু এবং তামাকের চাষ শিখিয়েছিলো। প্রথম দিকে ওরা ইউরোপীয়দেরকে সানন্দে বরণ করেও নিয়েছিলো। ওদের আতিথেয়তার ফলেই ইংরেজ জাহাজ মে-ফ্লাওয়ার-এর পিলগ্রীম-গণ এক বছরের মতো বেঁচে থাকার পর ঈশ্বরকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানাতেপেরেছিলো। সেই থেকে এখনো প্রতি ছাব্বিশে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে থ্যাঙ্কস-গিভিং-ডে পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ইন্ডিয়ানদেরকেই সভ্য মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়।

আমেরিকার স্বাধীনতার সময় দেশটির সীমানা ছিলো অ্যাপালাশাইন পর্বতমালার পূর্ব-প্রান্ত পর্যন্ত। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তি রক্ষার্থে পর্বতমালার পশ্চিম পাড়ে বসতি স্থাপন সরকার অনুৎসাহিত করতো। সীমান্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ের নীতিমালা নর্থওয়েস্ট অর্ডিন্যান্স-এ বলা হয়েছিলো–

"The utmost good faith shall always be observed toward the Indians; their land and property shall never be taken from them without their

www.pathagar.com

consent; and in their property, ritghts and liberty they never shall be invaded or disturbed...

এই অঙ্গীকার বাস্তবে রক্ষা করা যায়নি। পরবর্তীকারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পশ্চিম পাড়ে স্বর্ণ আবিস্কারের ফলে দলে দলে অভিযাত্রীরা পশ্চিম অংশেও বসতি স্থাপন শুরু করে। তাই নেটিভদেরকে আরো পশ্চিমে কোনো একটি স্থানে স্থানান্তরের চিন্তা করা হয়। ১৮৩০ সালে কংগ্রেসে ইন্ডিয়ান রিমুভ্‌ল এ্যাক্টে পাস করা হয়: মিসিসিপি নদীর পূর্ব অংশে অবস্থিত সকল নেটিভ ইন্ডিনিয়ানদের নদীর পশ্চিম অংশের রিজার্ভেশনে চলে যেতে হবে। স্থানান্তরের প্রথম বলি হয় Cherokee গোত্র। ওরা ততোদিনে ইউরোপীয়দের অনেক আচার-আচরণ গ্রহণ করে জর্জিয়াতে বসবাস করছিলো। ওদের ভাষা Sequoya-তে ১৮২১ সাল থেকে ওরা একটি সংবাদপত্রও প্রকাশ করতো। কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো এবং ওদের ভাষায় বাইবেলের অনুবাদও প্রকাশ করেছিলো। সবচেয়ে বড়ো কথা ওরা একটা সরকার গঠন করেছিলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ধাঁচে একটি সংবিধানও রচনা করেছিলো। কিন্তু ওদের আদিভূমি জর্জিয়ায় স্বর্ণ আবিস্কারের ফলে শ্বেতাংগদের চাপের মুখে ওদেরকে ভিটেমাটি ছেড়ে ওকলাহোমায় যেতে বাধ্য করা হয়। ১৮৩৮ এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চার-চারটি সামরিক অভিযান চালানো হয়েছিলো Cherokee-দের বিরুদ্ধে। জনমতের বিরুদ্ধে একদল Cherokee-এর সঙ্গে তথাকথিত এক চুক্তি করে ওদের ওপর স্থানান্তরের আদেশ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। বন্ধুর রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগতো প্রায় পাঁচ মাস। ষোল হাজার জনগোষ্ঠীর এক চতুথাংশ অর্থ্যাৎ প্রায় চার হাজার জন মারা যায় এই কষ্টকর স্থানান্তরের ফলে। একটা ফেরীডুবিতেই মারা গিয়েছিলো তিনশ জন। স্থানান্তরের এই লজ্জা আর দুঃখের ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বলা হয় The Trail of Tears.

Cherokee-দের দুঃখের ইতিহাস বলতে বলতে Lice Woo-এর চোখে বোধ হয় জল চলে আসার উপক্রম হয়েছিলো। Cherokee-দের ওই ঘটনার স্মরণেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো প্রদর্শনীটি। ওই প্রদর্শনীটি দেখে কিন্তু ওদের এই হৃদয়বিদারক ঘটনা উপলব্ধি করার কোনো উপায় নেই। Lice Woo-এর সঙ্গে দেখা না-হলে বোধ হয় ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আমার কাছে অজানাই থেকে যেতো। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আরো একটি প্রবন্ধ পড়ে জেনেছি, কিভাবে সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে Sioux-দেরকে মেসৌরী নদী ও রকি পর্বতমালার মধ্যবর্তী ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে অধিগ্রহণকৃত পবিত্র Black Hills ফিরে পাওয়ার জন্যে আজো Sioux-রা আইনের যুদ্ধ করে যাচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে। Sioux লেখক Vine Deloria রচিত Custer Died for Your Sins গ্রন্থটি প্রতিটি সভ্য আমেরিকানের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

১৯২৪ সাল থেকে ইন্ডিয়ানরা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের মর্যাদা পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইন্ডিয়ানগোষ্ঠী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির সংখ্যা

www.pathagar.com

প্রায় ৩৭০। বর্তমানে বিভিন্ন ইন্ডিয়ানগোষ্ঠীর উত্তরসূরীরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের মামলা করে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপুরণ আদায় করে নিচ্ছে। ঐ অর্থ ব্যবহার করে কোনো-কোনো গোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। কোনো-কোনো গোষ্ঠীর কোনো-কোনো সদস্য বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমেরিকান 'মেল্টিং পটে' মিশে গেছে। কেউ-কেউ রাজনীতিতেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ১৯২৮ সনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিউবার্ট হুবার তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন কেনসাস এর Charles Curtix-কে। বলা বাহুল্য যে, Curtix ছিলেন একজন আদি ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান। তবে ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূতদের মধ্যে সবচেয়ে সাফল্যের পরিচয় বোধ হয় দিতে পেরেছেন এডিথ বোলিং গাল্ট নামের বিধবা মহিলাটি। তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস Pocahontas এর নবম অধস্তন বংশধর। ১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনকে বিয়ে করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডীর সম্মান লাভ করেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পেনসিলভানিয়ার আমিশ ভিলেজ: যুক্তরাষ্ট্রের শোকেজ?

আমেরিকায় একদল লোক আছে যারা আধুনিক সভ্যতার উপকরণ থেকে এখনো নিজেদেরকে দূরে রাখতে পেরেছে। ওরা ধর্মে মেনোনাইট খ্রিষ্টান। পেশায় মূলত কৃষিজীবি। অষ্টম শ্রেণীর বেশী কেউ পড়াশুনা করে না। স্কুলগুলোও এক-কক্ষ বিশিষ্ট। বিদ্যুতের ব্যবহার পরিহার করে চলে। কেরোসিন ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলোতে রাতের আঁধার দূর করে। কেউ কখনো সিনেমা দেখেনি। কারো বাড়িতেই রেডিও, টিভি, কিম্বা ঘড়ি নেই। আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে সময় বুঝে নেয়। জন্ম-শাসনের বালাই নেই ওদের। প্রতিটি পরিবারেই তাই অনেকগুলো সন্তান। ওরা স্ত্রী-পুরুষ সবাই মিলে মাঠে কাজ করে। প্রায় প্রতিটি পরিবারই গরু, হাঁস-মুরগী পালন করে। ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে কালো পোশাক পরে। ছেলেদের বেশিরভাগই দাঁড়ি ও কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল রাখে। মেয়েদের মধ্যেও সাজ-সজ্জার বালাই নেই। অনেক দিক থেকেই ওদের সঙ্গে আমাদের কৃষকের মিল। তবে ওদের ধর্ম-বিশ্বাসই ওদেরকে এখানে আটকে রেখেছে। আর আমাদের কৃষকরা দারিদ্র্যের কারণে আধুনিক সভ্যাতার ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত। হাজার বছরের শোষণ আর বঞ্চনার কারণে সৃষ্ট এক দুষ্ট চক্রের আবর্তে আটকা পড়ে ঘুরপাক খেয়ে মরছে আমাদের কৃষক। আমেরিকার এই জনগোষ্ঠী এ দেশে "আমিশ" নামে পরিচিতি। প্রায় সাত-আট বছর আগে ওদের সর্ম্পকে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায়। তখনই মনে মনে ভেবেছিলাম যদি কোনো দিন সুযোগ হয় তবে ওদের এই জীবন-ধারা নিজ চোখে দেখবো। শেষ পর্যন্ত এই সুযোগ এসেই গেল। আমাদের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ড. ষ্টিভ আরনল্ড যখন পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি যাবার আমন্ত্রণের কথা জানালেন তখন এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। পেনসিলভানিয়া রাজ্যেই রয়েছে আমিশ-কৃষকদের এক বিরাট বসতি। শর্ত জুড়ে দিলাম ফেরার পথে আমিশ-দের গ্রাম দেখতে যাবো। সেভাবেই অনেক পরিশ্রম করে কিটি প্রোগ্রাম সাজালো।

নির্ধারিত দিনে আমরা চৌদ্দ জন হামফ্রে-ফেলো কিটি শেরউইনকে নিয়ে রওনা হলাম। মাইক্রোবাসের ড্রাইভার, আমাদেরই সতীর্থ-ফেলো, পোল্যান্ডের মাইক। মাইকের

www.pathagar.com

প্রকৃত নাম Meciez Lency। দেশে ফিরে মাইক পোল্যান্ডের অর্থ-উপমন্ত্রীও হয়েছিলো। বিশাল দেহের অধিকারী মাইকের হৃদয়টি বোধ হয় ছিলো দেহের চাইতেও বিশাল। সদা হাস্যোজ্জ্বল মাইক মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের দু'বছর বয়সী মেয়েটিকেও ওর ভক্ত করে ফেলেছিলো। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে দশটায় রওন হয়ে গেটিসবার্গ পৌছলাম এগারটায়। গেটিসবার্গ পেনসিলভানিয়া অংগরাজ্যে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। যাবার পথে গেটিসবার্গ দেখে যাবার বুদ্ধিটা কিটির মাথা থেকেই এসেছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময় ১৮৬৩ সালের ৩রা জুলাই এই গেটিসবার্গেই উত্তরের ইউনিয়ন-ফোর্স দক্ষিণের কনফেডারেট-ফোর্সকে পরাজিত করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে এ-যুদ্ধের পরই আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে ইউনিয়নিস্টদের পক্ষে। তাই ঐতিহাসিক এই স্থানটিতে তৈরী করা হয়েছে এক বিরাট কমপ্লেক্স। স্থাপন করা হয়েছে স্মৃতি স্তম্ভ, তৈরী করা হয়েছে যাদুঘর, সিনেমা হল, লাইব্রেরী, সাইক্লোরামা। যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের কবরগুলোকেও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইলেকট্রিক ম্যাপের মাধ্যমে যুদ্ধের সময়কার ইউনিয়ন-ফোর্স এবং কনফেডারেট-ফোর্সের অবস্থান এবং রণকৌশলকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই স্থানটি আরো একটি কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে। গেটিসবার্গ যুদ্ধের কয়েকদিন পরই প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন এই স্থানে দাঁড়িয়ে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ওই ভাষণের একটি উক্তি 'Government for the people, of the people and by the people' সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে বেদবাক্যের মতো সত্য হয়ে আছে। অথচ ওই ভাষণেই লিঙ্কন বলেছিলেন, 'আজকের এ জনসভায় আমি যা বলছি হয়তোবা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে তার কোনো মূল্য থাকবে না'। লিঙ্কনের এই ধারণা মিথ্যে হয়ে তাঁর ওই ভাষণ একটি ঐতিহাসিক ভাষণের মর্যাদা পেয়েছে, শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সারা বিশ্বের গণতন্ত্রমনা মানুষের কাছে।

গেটিসবার্গে লাঞ্চ করে আবার যাত্রা। লক্ষ্য পেনস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়। সারা পথ জুড়েই নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য। কোথাও বনভূমি, কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাওবা সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদী। বাড়ি-ঘরগুলোতে এমনভাবে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, মনে হয় যেন কোনো দক্ষ শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্র। যতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছাচ্ছি ততোই শীতের তীব্রতা যেন বাড়ছে। শহরের কাছাকছি পৌঁছেই চোখে পড়লো শ্বেতশুভ্র বরফের ছড়াছড়ি। পরে জানলাম মার্চের শেষ হলেও কয়েকদিন ধরে এখানে বরফ পড়েছে প্রচুর। দশ-পনের দিন হয়ে-যাওয়া সত্ত্বেও বরফগুলো এখনো গলেনি। পাঁচটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ভবনের নীচে অধ্যাপক সাইদুর রহমান তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ড. রহমান একজন বাংলাদেশী, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হামফ্রে-প্রোগ্রামের কোঅর্ডিনেটর। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বিভিন্ন আমেরিকান পরিবারের সাথে। আমার এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ডেবোরা-এর হোস্ট প্যাটন টাওনশিপের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর সিন্ডি বি রোলিনস্। ওঁর স্বামী টিমোথি জে রোলিনস

www.pathagar.com

পেনস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক। বাসায় পৌঁছে কিছুটা সময় বিশ্রামের পর সিন্ডি আমাদের রাতের খাবার-তৈরীতে লেগে গেল। ডেবোরো নিজ উদ্যোগেই ওঁর সাথে হাত মিলালো। আমি আর টিমোথি ওদের পাশে গিয়ে নানান গল্প জুড়ে দিলাম। আমদের দেশের রান্নাঘরটিকে যেন লুকিয়ে রাখা হয়, মেহমানদের ওখানে প্রবেশ নিষেধ। আর ওদের রান্না ঘর এবং খাবার ঘরটাকে একত্রে মিলিয়ে এমনভাবে তৈরী করা হয় যে ওই ঘরে মেহমান নিয়ে বসতে করো মনে বাধে না। খাবার সময় টেবিলে বসার পর বাকি তিন জনই টেবিলের ওপর দুই হাত উপুড় করে চোখ বন্ধ করলো। সিনডি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো। কথাগুলো অনেকটা এই রকম: হে ঈশ্বর তুমি-যে আমাদের জন্যে আজকের খাবারের ব্যবস্থা করেছো সে-জন্যে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতেও তুমি জমিতে ফসল দিয়ো, গরুর বুকে দুধ, আর মৌচাকে মধু দিও, আমাদের সন্তানদেরকে নিরাপদে রেখো, ইত্যাদি-ইত্যাদি। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা চললো চার জনের মধ্যে। এ জাতীয় আড্ডায় যার-যার পেশাগত সমস্যার কথা চলে আসে বার-বার। আমার সঙ্গে সিন্ডির পেশাগত কিছুটা মিল থাকায় ওঁর সঙ্গে ভালোই জমলো। এক সময় কৃষি-অর্থনীতি গবেষণার সাথে জড়িত ছিলাম বলে টিমোথির সঙ্গেও তাল মেলাতে কোনো অসুবিধা হলো না। পেনসিলভানিয়াকে বলা হয় এ দেশের দুগ্ধভান্ডার। প্রচুর ডেয়ারী রয়েছে এই রাজ্যটির বিশাল এলাকা জুড়ে। ঐ-সব খামারে গরুর গোবর সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত হয় পুরনো খবরের কাগজ। কাগজ এবং গোবরের সংমিশ্রণে উৎপাদিত সার জমিতে ব্যবহার করে স্থানীয় কৃষকরা। খবরের কাগজের কালিতে রয়েছে কৃত্রিম কেমিক্যাল দ্রব্য। জমিতে ব্যবহৃত সার, বৃষ্টি অথবা সেচের জলের সঙ্গে চুইয়ে মিশে যায় সমুদ্রে। এতে করে সমুদ্রের মৎস সম্পদের ক্ষতি হয়, নষ্ট হয় পরিবেশ। এই নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় কৃষক, জেলে এবং পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে। একদিকে পরিবেশ-সংরক্ষণ, অন্যদিকে এই এলাকার হাজার হাজার কৃষকের সমস্যা, যার সঙ্গে পেনসিলভানিয়া রাজ্যের অর্থনীতি অনেকভাবেই জড়িত। এ সমস্যার সমাধান কোথায়? এ জাতীয় সমস্যা শুধুমাত্র পেনসিলভানিয়ায় নয়; সারা বিশ্বেই পরিবেশ বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কি আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করবো? নাকি ভবিষ্যত বংশধরদের কথা চিন্তা করে বর্তমানের অর্থনৈতিক উন্নতিকে জলাঞ্জলি দেবো? এই দু'য়ের মধ্যে কি একটা সমন্বয় করা যায় না? টিমোথির ধারণা: করা যায়। ওঁর সঙ্গে একমত না-হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

একটা পর্যায়ে, কিভাবে যেন বসনিয়া প্রসঙ্গ উঠে এলো। সিন্ডি তখনই-মাত্র জানলো যে আমি মুসলিম। আমি নিজেও বেশ অবাক হলাম। কারণ এ-জাতীয় প্রোগ্রামে হোস্টকে গেস্ট-এর ধর্ম, জাতীয়তা, ভাষা, ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই তথ্য দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখে অবাকই হলাম। সিন্ডি বিব্রত হয়ে বার বার আমার কাছে ক্ষমা চাইলো;

www.pathagar.com

খাবার টেবিলে আমাকে প্রার্থনায় যোগ দিতে হয়েছিলো বলে। ও জানালো, ও নিজে লুথারান খ্রিষ্টান। তাই খাবার আগে প্রার্থনা করে নেয়। আমি বার বারই ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ওর প্রার্থনায় এমন কোন কথা বলা হয়নি যাতে আমার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে। পরবর্তীতে দুই দিন কাটলো এখানকার কাউন্টিতে বিভিন্ন সভা, আলোচনা, ব্রিফিং, ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে। এক ফাঁকে ড. রহমানের সহকারী এমি মিলার-এর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ছোট অথচ সুন্দর ঐতিহাসিক শহর বেলফন্ত গিয়ে ঘুরে এলাম। কেন্দ্রীয় ফেডারেল-সরকার ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে; রাজ্য, কাউন্ট্রি, টাউনশীপ/মিউনিসিপ্যাল ও বিশেষ (স্কুল) সরকার। এই পাঁচ ধরনের সরকার এবং এদের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে সুন্দর একটা কার্যকারী ভারসাম্য রয়েছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কার হাতে বা কোন স্তরে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে পঞ্চাশটি রাজ্যের তিন হাজার দু'শ কাউন্টি সরকার যে এদেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে আসছে সে-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পেন স্টেট কলেজ শহরে তিনদিন কাটিয়ে লাঞ্চের পর রওয়ানা হলাম ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টির উদ্দেশে। ওখানকার প্যারাডাইজের' আমিশ্ ভিলেজ' দেখার জন্যে পূর্বেই প্রোগ্রাম ঠিক করা আছে। নির্ধারিত ভারডেন্ট ভিউ খামারে যখন পৌঁছলাম তখন সান্ধ্য সূর্যের রক্তিম আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গৃহকর্তা মি. ডন র‍্যাঙ্ক বাড়িতে নেই। ওদের মেয়ে হিদার আমাদের অভ্যর্থনা জানালো! চটপটে বুদ্ধিমতি কিশোরী মেয়েটি এ বছরই স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস ক'রে উচ্চ শিক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। ও এবং ওর দশ বছর বয়সী ছোট্ট বোন পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে মাকে খামারের কাজে সব সময়ই সাহায্য করে। বিশেষ ক'রে গরুগুলোর পরিচর্যার জন্যে ওদেরকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়। সন্ধ্যার পর মি. ও মিসেস র‍্যাঙ্কের সঙ্গে পরিচয়। মি. র‍্যাঙ্কের সঙ্গে যখন হাত মিলালাম তখন মনে হলো এমন শক্ত এবং পেশীবহুল হাতের স্পর্শ কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় না। হাত মেলানোর সময়ই অনুভব করলাম এ হাত পরিশ্রমের হাত। আমাদের দেশের শিল্পী সুলতান তার চিত্রগুলোতে এমনি ধরনের পেশীবহুল মানুষের কল্পনা করে গেছেন সারাজীবন ধ'রে। সুলতানের কল্পনা কি কল্পনাই থেকে যাবে? অনেক রাত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গল্প চললো। খামার বাড়িতেই রাত কাটালাম। সে এক সুন্দর এবং ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা। পরদিন ভোর বেলা উঠে দেখি মি. র‍্যাঙ্ক তার স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে নিয়ে গরুর পরিচর্যায় লেগে গেছেন। কোনো এক ফাঁকে হিদার সকলের জন্যে নাস্তা তৈরী করে ফেলেছে। খামারের দুধ, মধু, পনির, ডিম, ঘরে তৈরী রুটি ইত্যাদি ব্যতিক্রমধর্মী খাবার দিয়ে নাস্তা। মি. র‍্যাঙ্কের পরিবার মেনোনাইট খ্রিষ্টান। খাবারের পূর্বে সিন্ডির বাড়ির মতো আবার একইভাবে প্রার্থনা এবং ইশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ক্ষণিকের জন্যে হলেও মনের মধ্যে একটা প্রশান্তির ভাব এনে দেয়।

www.pathagar.com

মি. র‍্যাঙ্কের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে পৌঁছলাম মেনোনাইট সেন্টারে। ওখানে গাইড মি. কিং আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। সেন্টারটি নতুন করে সাজানো হচ্ছে। তবে মেনোনাইট এবং আমিশ-দের জীবনধারা নিয়ে একটি প্রামাণ্য ছবি দেখতে কোনো অসুবিধা হলো না। আমিশ এবং মেনোনাইটদের উৎপত্তি একই উৎস থেকে। উভয় গোত্রই সুইজারল্যান্ডের এ্যানা ব্যাপটিস্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। এ্যানা ব্যাপটিস্টদের উৎপত্তি ১৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে। ওদের এক ধর্মীয় নেতা মেনরো সাইমন-এর নামানুসারে ওদেরকে বলা হয় মেনোনাইট। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে জ্যাকব আমমান নামের আরেক জন গোঁড়া ধর্মীয় নেতা অনুভব করেন যে, ওঁদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শিথিল হয়ে পড়েছে। তাই তিনি তাঁর সমর্থকদের নিয়ে গড়ে তোলেন পৃথক উপাসনা-রীতি ও জীবন-ব্যবস্থা। জ্যাকব আমমান-এর অনুসারীরা আজ আমিশ নামে পরিচিতি। মেনোনাইট এবং আমিশ উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীই ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের বিরাগভাজন হন। কারণ 'রাষ্ট্র থেকে চার্চকে পৃথক কর' ওঁদের এই তত্ত্ব তৎকালীন ইউরোপে তেমন একটা সমর্থন লাভ করতে পারেনি। তাই ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে ওঁরা উইলিয়াম পেন-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে এখানে এসে বসতি শুরু করে ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে। দলে দলে মেনোনাইট এবং আমিশরা সুইজারল্যান্ড, জার্মানী ও ফ্রান্স ত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায়। বর্তমানে ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টি ছাড়াও ওহিও এবং ইন্ডিয়ানাতে আমিশ বসতি রয়েছে।

ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টিতে প্রায় চৌদ্দ হাজার আমিশ রয়েছে। পরিবারের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। মূল ধর্মবিশ্বাসে এক হয়েও মেনোনাইটরা যেখানে আধুনিক সভ্যতার সকল উপকরণ ব্যবহার করে, আমিশরা সেখানে সকল আধুনিকতা সযত্নে পরিহার করে। এমনকি নিজ ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাইরে কারো সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখাকেও ওরা অপছন্দ করে। তবে কোনো কোনো আমিশ আজকাল উইন্ডমিল বা ডায়নামো চালিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে। আজকাল প্রচুরসংখ্যক পর্যটক আমিশ গ্রামগুলো পরিদর্শনে আসছে। যে-কোনো ধরনের পর্যটককেই ওরা অপছন্দ করে, কেউ ছবি তুলতে চাইলে কিম্বা কথা বলতে চাইলে ওরা সযত্নে তাদেরকে এড়িয়ে চলে। ওদের কোনো পৃথক চার্চ বা উপাসনা-গৃহ নেই। পালাক্রমে একেক দিন একেক জনের বাড়ির আঙ্গিনায় ওরা প্রার্থনা করে। ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টিতে ওদের মধ্যে এরকম পঁচানব্বইটি প্রার্থনা গ্রুপ রয়েছে।

আমাদের গাইড মি. কিং-ও একজন মোনোনাইট খ্রিষ্টান। ওর সঙ্গে একটা আমিশ পরিবারের জানাশোনা আছে। তাই একটা আমিশ বাড়িতে ঢোকার সুযোগ পেলাম। বাড়িতে গৃহকর্তার একমাত্র যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ছাড়া আর কেউ নেই। ওই ভদ্রলোকই অনুৎসাহের সঙ্গে বাড়িটি, বিশেষত বাড়ির সঙ্গের গরুর খামার এবং ঘোড়ার আস্তাবলটি ঘুরে দেখালেন। ঘোড়ার আস্তাবল থেকে এমন দুর্গন্ধ আসছিল যে, তা ভোলার নয়। মনে পড়লো গত রাতে আমিশদের দুর্গন্ধের প্রতি উদাসীনতা নিয়ে হিদার একটি বহুল প্রচলিত জোক্স বলেছিলো। এই জাতীয় জোকসগুলো সৃস্টি হওয়ার পেছনে বোধ হয় বাস্তবভিত্তিক

www.pathagar.com

কোনো কারণ থাকে। যদিও মি. কিং কোনো প্রশ্ন না-করার জন্যে পূর্বেই অনুরোধ করেছিলো, তবুও লোভ সামলাতে না-পেরে ওই আমিশ তরুণকে তাদের এইভাবে জীবন যাপনের কারণ কি তা জানতে চাইলাম। This is the best way of living—এক বাক্যের এই সুন্দর উত্তরটি যে কাউকেই মুগ্ধ করবে। এক সময় মি. কিং-এর অনুরোধ ওঁর বাড়িতে যেতে হলো। ওঁর বারজন ছেলে মেয়ে। এক ছেলে বাংলাদেশে কাজ করেছে এক সময়। কিছুদিন আগে মি. ও মিসেস কিং-এর পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকী গেছে। বারজন ছেলে মেয়ে তাদের পরিবারের ছবি নিয়ে একটি ক্যালেন্ডার তৈরী ক'রে উপহার দিয়েছে বাবা-মাকে। একেক জন ছেলে-মেয়ে নিয়েছে একেক পৃষ্ঠা। আরেকটি উপহার দিয়েছে পঞ্চাশ জন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব মিলে। প্রত্যেক পরিবার এক টুকরো কাপড়ে যার-যার পছন্দমতো বাণী লিপিবদ্ধ করে দিয়েছে। পঞ্চাশ টুকরো কাপড় সেলাই দিয়ে বিরাট একটা ওয়াল ম্যাট তৈরী ক'রে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বসার ঘরে। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী উপহার দু'টি যে-কোনো মানুষেরই ভালো লাগবে। মি. কিং-এর বাড়ি থেকে ফেরার পথেই একটা আমিশ স্টেশনারী কাম- গ্রোসারী স্টোর। দোকানের মালিক আমিশ হলেও দোকানে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, স্থানীয় পণ্যের সাথে বাইরের পণ্যও তুলেছেন বিক্রির জন্যে। আমরা দোকানের ভেতর থাকতেই এক আমিশ ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে দোকানে এলেন। সঙ্গে দুই কিশোরী কন্যা। ভদ্রলোক দোকান থেকে বিভিন্ন মুদী-দ্রব্যাদি কিনছিলেন। আর কালো পোষাকে আবৃতা মেয়ে দু'টিকে দেখলাম প্রসাধনী দ্রব্যাদির শেলফের কাছে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সামগ্রী দেখছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম একজন আরেকে জনকে বিভিন্ন পারফিউম দেখাচ্ছে আর কি-সব আলোচনা করছে। ভদ্রলোক, সম্ভবত মেয়ে দু'টির বাবা, তার কাজ শেষ করে বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলো। মেয়ে দু'টিও তার পিছু পিছু গাড়িতে চেপে বসলো। প্রসাধনী-দ্রব্যের প্রতি ওদের আকর্ষণের কথা অব্যক্তই রয়ে গেল এবারের মতো। ভবিষ্যতেও তা চাপা পড়ে থাকবে কি-না বলা মুশকিল।

গ্রোসারী-স্টোর থেকে বের হয়ে ফিরে আসছি মহাসড়কের দিকে। ছোট্ট একটা খালের ওপর সেতু, সেতুটির দু'দিকে কাঠের দেয়াল দিয়ে ঢাকা। একটা ব্যতিক্রমধর্মী সেতু, এরকম আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মি. কিং জানালো সেতুটির নাম কিসিং ব্রিজ। আমিশ মেয়েরা তাদের প্রেমিককে প্রথম চুম্বন এই ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে করে বলে এর নামকরণ এমনটি হয়েছে। নিরিবিলিতে চুম্বনের সুবিধার্থেই কি ব্রিজটিকে দু'দিক থেকে ঢেকে দেয়া হয়েছে?

ফেরার পথে গাড়িতে আমিশদের নিয়েই আলোচনা হচ্ছিলো। জর্ডানের ওয়ালিদ কিটিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করে বসলো—

: আমিশরা-যে ওদের ছেলে-মেয়েদেরকে অষ্টম শ্রেণীর বেশি পড়তে দেয় না, এ বিষয়ে তোমাদের সরকার বাধা দেয় না কেন? এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করে সরকার ওই শিশুদের প্রতি অন্যায় করছে।

www.pathagar.com

: আমাদের দেশ ব্যক্তি-স্বাধীনতার দেশ। ওদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে সরকার কিছু করতে চায় না। কিটির উক্তি।

: কেন? বিশ্বের অনেক দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আসলে যুক্তরাষ্ট্রে তোমরা আমিশদেরকে একটা শো-কেস হিসেবে রেখে দিতে চাও।

সারাটা পথ ধরেই কিটি এবং ওয়ালিদের যুক্তি বা পাল্টা যুক্তি চললো। আমরা মাঝে মাঝে নানারকম টিকা-টিপ্পনী কেটে বিতর্কটা উপভোগ করলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নি'অরলিন্স: ফরাসী সংস্কৃতির একটু ছোঁয়া

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায়ই মাহমুদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, ওর ওখানে যাবার জন্য। মাহমুদ, অর্থাৎ ড. মাহমুদ খান তখন নি'অরলিন্স-এর টিউলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। দি আমেরিকান ইউনিভার্সিটির হামফ্রে-রুমে একদিন নানা বিষয় নিয়ে আড্ডা চলছিলো। ত্রিনিদান ও টোব্যাগোর মেয়ে ডেবোরা দাবি করে বসলো ওদের দেশের ক্যালিপসু কার্নিভালই হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কার্নিভাল অনুষ্ঠান। তা হলে বৃহত্তমটা কোথায় হয়? আমার প্রশ্নের উত্তরে কেউ একজন বললো জার্মানীতে। ডেভিড করিংটেম, হামফ্রে প্রোগ্রামে কিটির অন্যতম সহযোগী দাবি করলো নি'অরলিন্সে। ওঁর মতে নি'অরলিন্সের mardi gra অনুষ্ঠান হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম কানির্ভাল।

: তাহলে তো যেতে হয় মাহমুদের ওখানে mardi gra দেখার জন্যে।

: সম্ভব হলে এমন সুযোগ হাত-ছাড়া করো না। তাছাড়া সারা দুনিয়ার কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের তীর্থস্থান হচ্ছে নি'অরলিন্স-এর ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার। কবি-সাহিত্যিকরা এ দেশে এসে ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের Cafe de monde-এর কফি পান না-করে দেশে ফিরেছে এমনটি তুমি কমই পাবে।

: আমি কবি-সাহিত্যিকও নই, বুদ্ধিজীবীও নই। সাধারণ এক নীরস আমলা। আমার জন্যে আকর্ষণীয় কি আছে ওখানে?

: তা হলে mardi gra-এর সময়ই ওখানে যাও তুমি। রসবোধ তোমার না-থাকলেও কার্নিভালের বিচিত্র বেশভূষা, নিদেন পক্ষে আমেরিকান সুন্দরীদের অর্ধনগ্ন দেহ তোমার মনে রসবোধ জাগিয়ে তুলবে।

: কল্পনা করতেই রোমাঞ্চিত বোধ করছি, ডেভিড। আমি যাবো।

সত্যি-সত্যিই একদিন সুযোগ এলো নি'অরলিন্সে যাওয়ার। Association for Economic and Development Studies on Bangladesh-এর আঞ্চলিক সম্মেলন হবে নি'অরলিন্সে। সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা নি'অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কবির হাসান-এর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম দু'দিনব্যাপী ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে।

www.pathagar.com

সম্মেলনে যোগদান, মাহমুদের ওখানে বেড়ানো, নি'অরলিন্স দেখা–এক সঙ্গে সবকিছু করতে গিয়ে mardi gra কেই বাদ দিতে হলো। কারণ সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই mardi gra শেষ হয়েছে।

নির্ধারিত দিনে ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বিমানে চাপলাম। ওয়াশিংটন থেকে ডাল্লাস তিন ঘন্টা পনের মিনিট-এর জার্নি। সেখান থেকে বিমান বদল করে ঘন্টা খানিক পর নি'অরলিন্স। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ডাল্লাসের তিন ঘন্টা পনেরো মিনিটের যাত্রাপথে খেতে দিলো গোটা কয়েক বিস্কুট এবং এক গ্লাস ঠান্ডা পানীয়। যুক্তরাষ্ট্রের সবগুলি বিমান সংস্থারই অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী সেবার মান ততো ভালো মনে হয়নি আমার কাছে। আসলে এ দেশে বিমানে যাতায়াত করাটা এতোটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে যে আমাদের দেশের বাসের যাত্রী আর এদেশের বিমানের যাত্রীর অবস্থা অনেকটা একই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মাহমুদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অনেকগুলি বছর একত্রে কাটিয়েছি। ছাত্র জীবনেই বিআইডিএস-এর ভিলেজ স্টাডি গ্রুপে ড. স্বপন আদনান ও ড. হোসাইন জিল্লুর রহমানের সঙ্গে মাহমুদ, শাহনূর (শ্যামল), পারভেজ ইমদাদকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করেছি অনেক দিন। নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। তাই নি'অরলিন্সের দিনগুলি মাহমুদের বাড়িতে ভালোই কেটেছে। প্রথম রাতেই বের হলাম ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার দেখতে। সঙ্গে মাহমুদের স্ত্রী নাজমা ও দুই ছেলে শাফিন ও সামি। পুরনো আমলের সব দালান কোঠা, ফরাসী স্থাপত্য রীতিতে তৈরী। নি'অরলিন্স লুইজিয়ানা অংগরাজ্যে অবস্থিত। ফরাসী রাজা পঞ্চদশ লুইস এর নামানুসারে লুইজিয়ানা নামের উৎপত্তি। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার সময় লুইজিয়ানা ফরাসী অধিকারে ছিলো। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট জেফারসন মাত্র পনের মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে এই বিশাল ভূ-খন্ডটি কিনে নেন। তাই লুইজিয়ানার বিভিন্ন স্থানে এখনো ফরাসী সংস্কৃতির আধিপত্য রয়ে গেছে। বিশেষ করে নি'অরলিন্সের ফ্রেঞ্চ কেয়ার্টার এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতির ভগ্নাংশ এখনো টিকে আছে। ঐ এলাকার লোকজন ইংরেজি এবং ফরাসীর সংমিশ্রণে তৈরি একটা শঙ্কর ভাষায় কথা বলে। Cafe de monde -এ কফি পান করার সময় লক্ষ্য করলাম, দলে দলে পর্যটক; পায়ে হেঁটে কিম্বা ঘোড়ার গাড়িতে করে ঘুর-ঘুর করছে। বিশাল ছাদের নীচে চারিদিক খোলা Cafe de monde-এর বিভিন্ন টেবিলে তখন ধূমায়িত কফির কাপে তর্ক ও তাত্ত্বিক আলোচনার ঝড় উঠেছে। ওখানে বসে থাকতে থাকতেই আমার মনে হলো ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের সঙ্গে কি ওয়াশিংটন ডিসি-র জর্জ টাউন বিশেষত 'এম' ষ্ট্রীটের কোনো মিল আছে? হয়েতোবা আছে। কিম্বা অমিলের পরিমাণটা এতো কম যে, ওই মিল থাকাটা নিয়ে কেউ খুব একটা মাথা ঘামায় না। পুরনো দিনের ইংরেজ-এলাকা আর ফ্রেঞ্চ-এলাকার মধ্যেকার মিল- অমিলের বিষয় আমাদের এশিয়দের চোখ দিয়ে ধরাটা-যে কতো কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। তবে জর্জ টাউনের ছোট ছোট দোকানগুলির সাজ-সজ্জায় যেমন পুরনো দিনের বিলেতি কায়দাকে ধরে-রাখা হয়েছে

www.pathagar.com

তেমনি করে নি'অরলিন্সের Bourbon street-এর গিফট শপ কিম্বা নাইট ক্লাবগুলিতে পুরনো দিনের ফরাসী সংস্কৃতির একটু ছোঁওয়া পাওয়া যায় বটে। ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টার বাদ দিলে, নি'অরলিন্সের অন্যান্য এলাকায়ও সাধারণ আমেরিকান জৌলুসের একটা অভাব অনুভব করা যায়। ঠাট্টা করে মাহমুদ বলছিলো, লুইজিয়ানা হলো আমেরিকায় বাংলাদেশ, অর্থাৎ এদেশের অন্যতম দরিদ্র রাজ্য। বিশেষ করে তেলের মূল্য কমে যাওয়ার পর, তেল কোম্পানিগুলো লুইজিয়ানা থেকে বিদায় নেবার পর থেকে এর অর্থনীতি খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। তাই এখানে একটা ক্যাসিনো সিটি গড়ে তোলার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে।

কোনো শহরে বেড়াতে এসে সিটি ট্যুরের টিকেট কিনে বাসে চেপে বসলে সহজেই শহরটিকে ভালোভাবে দেখা যায়। কিন্তু ওই শহর ভ্রমণ উপভোগ্য হবে, না ক্লান্তিকর হবে তা অনেকটা নির্ভর করে গাইড-এর ওপর। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণও অপটু গাইড-এর কারণে ক্লান্তিকর হয়ে যেতে পারে। আবার কোনো সুদক্ষ গাইডের উপস্থাপনার ফলে একটি সাধারণ শহর-ভ্রমণও হয়ে উঠতে পারে অসাধারণ। নি'অরলিন্সে সিটি ট্যুরে আমার ভাগ্যে জুটেছিলো এইরূপ একজন দক্ষ গাইড। গ্রেলাইন ট্যুর কোম্পানীর সিটি ট্যুর-এর টিকিট কিনে সকাল বেলা বাসে চেপে বসলাম। ভদ্রলোক শহরের প্রতিটি দর্শনীয় স্থান আমাদের কাছে এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন যে মুগ্ধ না-হয়ে পারলাম না। শহরের ইতিহাস, বাড়িঘরের স্থাপত্যরীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পার্ক,কবরস্থান, জলাশয়, স্থাপত্যশিল্প, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আমি অন্য কোনো শহর-ভ্রমণের সময় শুনিনি। নি'অরলিন্স শহরটি মিসিসিপি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে প্রায়ই বন্যার সমস্যা লেগে থাকে। তাই শহর রক্ষার জন্যে রয়েছে একাধিক বাঁধ, পাম্প হাউজ এবং ৯৩ মাইল দীর্ঘ আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যানেল। শহরের বিভিন্ন সড়ক-দ্বীপ এবং পার্কে রয়েছে সৈনিকের স্ট্যাচু। বেশির ভাগ স্ট্যাচুর সৈনিকেরই ঘোড়ার বাম পা উঁচু। ঐসব স্ট্যাচুর সৈনিকগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করেছেন। আর ডান পা উঁচু করা ঘোড়ার পিঠে আসীন সৈনিকদের হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু।

শহর ভ্রমণের সময়ে আরেকটা মজার তথ্য পেলাম এখানে। শহরের কোনো কোনো এলাকায় একতলা লম্বা ধরণের বাড়ি দেখলাম। গাইড ঐ বাড়িগুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালো যে বাড়িগুলোতে একটি মাত্র দরজা এবং জানালা। এক সময় নি'অরলিন্সে বাড়ির সামনের দিকের দরজা এবং জানালার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বাড়ির ওপর কর ধার্য্য করা হতো। করের পরিমাণ কমানোর জন্যে অনেকেই এক দরজা কিম্বা দুই দরজা-বিশিষ্ট লম্বা বাড়ি তৈরী করেছিলো। এক দরজা বিশিষ্ট বাড়িগুলি Shot gun house এবং দুই দরজা বিশিষ্ট বাড়িগুলি Double barrel Shot gun house নামে পরিচিত। কোনো কোনো লম্বা বাড়ির মাঝখানটা আবার উটের পিঠের মতো উঁচু করে তৈরি করা হয়েছে। ঐগুলিকে বলা হয় Camel back Shot gun house । ইতিহাসে, প্রথম থেকেই কর-ব্যবস্থা এবং করের পরিমাণ মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যকে নানাভাবে

www.pathagar.com

প্রভাবিত করে এসেছে জানি। কিন্তু বাড়ি-ঘরের স্থাপত্যরীতিকে যে এমনিভাবে প্রভাবিত করেছে তা আগে জানা ছিল না।

একদিন গিয়েছিলাম swamp tour-এ। এই ট্যুরটি কি ধরণের হবে, আগে কোনো ধারণা ছিলো না। পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে টিকিট কেটে মাহমুদ টুরিস্ট কোম্পানীর বাসে চড়িয়ে দিলো। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর বাসটি একটি বনাঞ্চলে খালের ধারে এনে নামালো আমাদের । প্রায় পনের জনের একটা দল। একমাত্র আমিই অ-শ্বেতাঙ্গ। একটা খাল দিয়ে বোটে করে ঘুরে বেড়ানো আর কাছিম, কাঁকড়া, সাপ, ইত্যাদি প্রাণী দেখে নয়ন-মন মুগ্ধ করা। এগুলো দেখে কারো-কারো কি উল্লাস ! একজন চোখ টিপে আরেকজনকে alligator দেখাচ্ছে। বাংলাদেশের ছেলে আমি। পঁয়ত্রিশ ডলার খরচ করে কাছিম, কাঁকড়া, দেখতে যাওয়া? মনের ভেতরটা খচ খচ করছিলো । টিকেট মাহমুদই কিনেছে, তবুওতো পঁয়ত্রিশ ডলার, মানে প্রায় এক হাজার চারশ টাকা! তবে ট্যুরটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। এখানেই এলিগেটর নামের এক ধরণের প্রাণী দেখলাম। দেখতে প্রায় কুমিরের মতো, তবে আকারে বেশ ছোট। এলিগেটরের মাংস নি'অরলিন্সে খাবার হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। এক ধরনের ফসলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো গাইড। খালের পাড়ে চাষ করা হয়েছে। আমাদের দেশের উপনিবেশিক আমলের করুণ ইতিহাসের সঙ্গে গাছটির নাম মিশে আছে–নীল গাছ। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে দেখেছি, ইতিহাসে পড়েছি নীল-চাষের কথা। নীল-চাষের সাক্ষী হিসেবে এখনো নীলকর সাহেবদের কিছু কুঠির ভগ্নাবশেষ রয়ে গেছে দুই বাংলায়। সেই নীল গাছ দেখলাম এসে লুইজিয়ানা রাজ্যের এক নিভৃত পল্লীতে। এ দেশের আরো কিছু অঞ্চলে নাকি এখনো নীলের চাষ হয়ে থাকে।

এক সন্ধ্যায় মাহমুদ নিয়ে গেল The causeway Bridge দেখাতে। চব্বিশ মাইল দীর্ঘ ব্রিজটি পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম জলের-ওপর-পুল। Lake Pontchartrain নামের জলাশয়ের ওপর ব্রিজটি নি'অরলিন্সের এর সাথে Mandeville কমিউনিটিকে সংযুক্ত করেছে। Lake Pontchartrain যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ অন্তর্দেশীয় জলাশয় (estuary)। আয়তন প্রায় ছ'শ দশ বর্গমাইল। তৎকালীন ফরাসী দেশীয় সমুদ্র-বিষয়ক মন্ত্রী Count de Pontchartain-এর নামানুসারে লেকটির নামকরণ করা হয়েছে। ব্রীজটি পার হয়ে যখন ফিরে আসছিলাম তখন মাঝ-পথে গাড়ি থামিয়ে ব্রিজের ওপর ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়ালাম। অদূরে আলো-ঝলমল নি'অরলিন্স নগরী। নীচে শান্ত-স্নিগ্ধ জল। জলের ওপর শহরের আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে একটা অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। পরে বুঝতে পারলাম নি'অরলিন্সে আসার দিন বিমানের জানালা দিয়ে যে-সুদীর্ঘ আলোর সারি দেখছিলাম তা এই ব্রীজের লাইট-পোস্টের আলো।

সারা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সাধারণত একই ধরনের খাবার পাওয়া যায়। তবু কোনো কোনো অঞ্চলের খাবারে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহৎ শেল ফিশ দিয়ে তৈরী abalone কিম্বা respberreis এবং black berries দিয়ে তৈরী

www.pathagar.com

boysenberry খেতে হলে যেতে হবে সানফ্রান্সিসকো, তেমনি নি'অরলিন্সে এসে অনেকেই খেয়ে যান এলিগেটর-এর মাংস কিংবা পো'বয়। পো'বয় শব্দটি poor boy শব্দের উচ্চারিত রূপ। দরিদ্র বালকদের খাবার হিসেবেই পো'বয় পরিচিত। অত্যন্ত স্বল্প মূল্যের খাবারটি বনরুটির ভেতরে মাগুর মাছ দিয়ে ক্যাট-ফিশ পো'বয় অথবা চিংড়ি মাছ দিয়ে শ্রিম্প পো'বয় তৈরি করা হয়। স্থানীয় কোপ ল্যান্ড রেস্টুরেন্টে মাহমুদ একদিন বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের লাঞ্চ করালো। এই রেস্টুরেন্টটিতে একটা মজার অভিজ্ঞতা হলো। হঠাৎ করে দেখলাম আমাদের পেছনের টেবিলের চারদিকে রেস্টুরেন্টের বেশ কয়েকজন ওয়েটার এবং ওয়েট্রেস জড়ো হলো। একযোগে শুরু করলো হ্যাপি বার্থ ডে টু ...। সঙ্গে কি একটা যন্ত্রবাদ্যর সঙ্গে করতালি। পরে জানলাম কারো জন্মদিনে যদি তিনি ওই রেস্টুরেন্টে আহার করেন তবে রেস্টুরেন্টের সকলে মিলে তাকে সুরের মাধ্যমে হ্যাপি বার্থডে জানাবে এবং এক গোছা ফুল উপহার দেবে। কাস্টমারের হৃদয় জয় করার এই পদ্ধতিটিকে আমার কাছে খুব ভাল লাগলো। আমাদের দেশের রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা কি কোনদিন এরকমটি ভেবে দেখেছেন ?

কনফারেন্সটি মোটামুটি ভালোই জমেছিলো। নি'অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছিলো বেশ কয়টি। সবগুলি প্রবন্ধই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে। দেশ থেকে দূরে থাকলেই নিজের দেশের সমস্যাকে কি কেউ ভুলে থাকতে পারে ? কনফারেন্সে উত্থাপিত প্রবন্ধগুলোই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়। নি'অরলিন্সের বাংলাদেশে সোসাইটিও ভালভাবে চলছে বলে মনে হয়। নিউইয়র্ক কিম্বা ওয়াশিংটন ডিসি-র বাঙালিরা যেমন বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত, এখানকার বাংলাদেশীরা সে-তুলনায় একতাবদ্ধ বলেই মনে হয়েছে আমার কাছে। আমার অল্প কয়েকদিনের অবস্থানকালীন সময়ে বাংলাদেশ সোসাইটির একাধিক প্রোগ্রামে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছে। ওদের প্রকাশিত পত্রিকা 'কানেকশন' ওদের মধ্যে সেতু-বন্ধনের কাজ করে। লুইজিয়ানার বাংলাদেশ-সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'উচ্চকিত সংলাপ' (১৯৯২) ও 'অবিনাশী শব্দাবলী' (১৯৯৩)—একুশের সঙ্কলন—দেখার আগে আমার কল্পনাও ছিলো না যে, ড. মাহমুদ খান এবং ওঁর স্ত্রী নাজমা খান কাব্যচর্চা করে। দেশের প্রতি বিরহই ওদেরকে কবি করে তুলেছে কিনা কে জানে!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফ্লোরিডার এপকট সেন্টার: ভবিষ্যত পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ

ট্রেনটি চলছে-তো-চলছেই। একটানা ঝিক-ঝিক শব্দ করেই চলছে। কতো শহর, জনপথের বুক মাড়িয়ে বিশাল অজগরের মত সর্পিল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এতটুকুও যেন ক্লান্তি নেই। রাতের আধাঁর কোনোভাবেই আটকে রাখতে পারছে না ওর চলার গতিকে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ঝিক-ঝিক শব্দটা যেন আরেকটু স্পষ্ট হচ্ছে। ওর চলার গতিও কি বেড়ে যাচ্ছে সেই সাথে? বলা মুশকিল। তবে দেহ-মনটাকে তন্দ্রার ভাব যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে ধীরে ধীরে।

'নটার ট্রেন কটায় ছাড়বে?' ব'লে আমাদের দেশে একটা জোক্স চালু আছে। এ দেশেও বাস, ট্রেন, কিম্বা বিমান-সংস্থাগুলি সময় 'ফেল' করার ক্ষেত্রে কম পারদর্শী নয়। ট্রেনটি ছাড়ার কথা ছিলো রাত আটটা চল্লিশে। কিন্তু ওয়াশিংটন ডিসি-র ইউনিয়ন স্টেশনের মাইকে যখন নির্ধারিত ট্রেনটিতে ওঠার জন্যে ঘোষণা দেয়া হলো তখন রাত ন'টা ত্রিশ। করিডোর পেরিয়ে ট্রেনে যাওয়ার পথেই এক বৃদ্ধার গিজ-গিজ 'এ্যাম ট্রাকের সেই সুদিন আর নেই। না-আছে যাত্রী-সেবার সেই মান, আর না-আছে সময় ধরে চলার সেই রেকর্ড। লাঞ্চ-কারে একবার ঢুকেই দেখ-না, খাবারের কি শ্রী! যদি তুমি মুখে তুলতে পারো! হাজারটা সমস্যায় পড়তে হবে তোমাকে বলে রাখছি'। বৃদ্ধার কথায় একটু ভড়কেই গেলাম। ষোল ঘন্টার জার্নি। যদি বাস্তবেই ওর কথা ঠিক হয় তবেতো বেশ মুশকিল। যদিও আমাদের দেশে এ-জাতীয় হাজারটা মুশকিলের সম্মুখীন হচ্ছি আমরা নিত্যদিন। তাই ব'লে পয়সা দিয়ে টিকেট কেটে খোদ যুক্তরাষ্ট্রে এরকম মুশকিলের সম্মুখীন হবো? মনটা কেন যেন মানতে চায় না। কেন যেন বলতে চায়, যদি তোমরা সব-কিছু ঠিক-ঠাকমতো চালাতেই না-পারলে তবে বিশ্ব-নেতৃত্বের দাবিই-বা করো কেন? মাত্র কয়েকদিন আগেইতো স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার সময় বর্তমান বিশ্বকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' ব'লে আখ্যায়িত ক'রে যুক্তরাষ্ট্রকেই তার নেতৃত্বদানকারী দেশ ব'লে দাবি করলেন। 'আমেরিকান স্পিরিট কনটিনিউ' করার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বান জানালেন। যাক সে-সব ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু ট্রেনে চেপে আমাকে একটি-মাত্র মুশকিলেরই মোকাবেলা করতে হলো। সেটাই ছিলো আমার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; আমাকে 'নয়টার ট্রেন ক'টায় পৌছাবে'-র মোকাবেলা

www.pathagar.com

করতে হলো। আমার গন্তব্যস্থল ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো। সেখানে নাকি ডিজনিওয়ালর্ড নামে কি-এক বিশ্ব তৈরি করা হয়েছে। হাজার রকম চোখ-ধাঁধানো আর মন-ভোলানো ব্যাপার-স্যাপার। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় এ্যামট্রাক্টের মাস-চুক্তি টিকেট কিনেছিলাম। এই টিকেট নিয়ে এক মাস যেখানে-ইচ্ছা-সেখানে ঘুরে বেড়াও—কোনোরকম অতিরিক্ত পয়সা দেবার বালাই নেই। শুধুমাত্র ফোন ক'রে সিট রির্জাভেশন ক'রে নিলেই হলো। সেই একমাস যায়-যায় অবস্থা। ওদিকে আমার প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর 'সেন্টার ফর ফিন্যানসিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর এক অতিরিক্ত কোর্সে ঢুকিয়ে দিয়ে হাত-পা সব বেঁধে ফেলেছে। ডিসি থেকে বের হবার কোনো ফুরসতই পাচ্ছিলাম না। ইঞ্জিনিয়ারিং- এর সঙ্গে লোহা-লক্কড় কল-কব্জার একটা সম্পর্ক আছে জানতাম, ভয়ে ওসব থেকে সব সময় দূরেই থেকেছি। ফিন্যান্স-শাস্ত্রের সঙ্গে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্পর্ক কি? শুরুতে-তো ভড়কেই গিয়েছিলাম। একটা কোর্স ডিজাইন ক'রে নাম একটা দিলেই হলো আর কি? বৈদেশিক সাহায্যের কৃপায় তৃতীয় বিশ্ব থেকে ছাত্র-ছাত্রীর আর অভাব হয় না। যাই হোক শনি-রবি বেছে নিয়ে ফাঁক-ফোঁকর বের করে ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে বের হয়েছি। এমনিতেই হাতে সময় নেই, তার ওপর পথই যদি অতিরিক্ত সময় খেয়ে ফেলে তবেতো বেশ মুশকিলই। কিসিমিতে পৌঁছনোর কথা একটা আটান্ন মিনিটে। পৌঁছতে বিকেল পাঁচটা-ত্রিশ। ইথিওপীয়ার সহপাঠিনী টুডু বার-বার ব'লে দিয়েছে 'অরল্যান্ডো পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কিসিমিতেই নেমে পড়বে। ছোট্ট স্টেশনের নামটা মনে রাখতে পারবে তো? Kiss me শব্দ দু'টি মনে থাকলেই চলবে।' এমন শব্দ দু'টি মনে না-রাখার মতো বেরসিক আর হই কিভাবে? স্টেশনের গেট দিয়ে বের হতেই কয়েকটি হোটেলের মাইক্রোবাস। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্যে হোটেলগুলির সুন্দর বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। পূর্বনির্ধারিত বে ওয়েস্টার্ণ হোটেলের বাসেই চাপতে হলো কয়েক মিনিটের পথ পাড়ি দেয়ার জন্যে।

পরদিন ভোরবেলা। হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মনে হলো আজ খুব সুন্দর রোদ উঠেছে। কাঁচা-মিঠা সোনালী রোদের আভা সারা অরল্যান্ডের প্রকৃতি জুড়ে যেন ভালবাসার পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। অদূরে কয়েকটি নারিকেল গাছের পাতার ওপর সোনালী রোদের ঝিকিমিকি। হোটেলের সামনের দিকে রাস্তার ওপারে অবারিত সবুজের মাঠ। আমার চোখে তখন আমাদের গ্রীণ রোডের বাড়ির নারকেল গাছের বীথিকার ওপর সোনালী রোদের পরশ। আরো গভীরে পারিল-নওয়াধা গ্রামের বাড়ির দক্ষিণ-প্রান্তের ঢেউ-খেলানো সবুজ ধান ক্ষেত। নস্টালজিয়ার পেছনে ব্যয় করার মতো সময়ের তখন বড়োই অভাব। বাধ্য হয়ে হোটেলের বাসে করে ছুটতে হলো ডিজনিওয়ার্ল্ড কমপ্লেক্সের উদ্দেশে। ডিজনিওয়ার্ল্ডের নির্মাতা ওয়াল্টার এলিস ডিজনি জন্মে ছিলেন ১৯০০ সালে শিকাগো শহরের এক দরিদ্র পল্লীতে। কার্টুন ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরির মাধ্যমে জীবন শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৯ সাল থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'ডিজনি ষ্টুডিওর' তৈরি কার্টুন ছবি সারা বিশ্বের শিশুদের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৫৫ সালে তিনি শিশুদের

www.pathagar.com

জন্যে ক্যালিফোর্নিয়াতে 'ডিজনিল্যান্ড' নামে এক কমপ্লেক্স তৈরি করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭১ সালে তাঁর কোম্পানী ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে গড়ে তোলে 'ডিজনি-ওয়ার্ল্ড' নামে বিশাল এক জগৎ। ম্যাজিক কিংডম, ডিজ্‌নি ভিলেজ, ইউনিভার্সেল পার্ক, ডিজ্‌নি এমজিএম ষ্টুডিও এপকট সেন্টার—একাধিক কমপ্লেক্স রয়েছে দেখার জন্যে। প্রথম তিনটি মূলত শিশুদের জন্য। অন্তিকা, আমার মেয়েটি, সাথে নেই। বিশেষ প্রয়োজনে কিছুদিন আগেই ওকে দেশে ফিরতে হয়েছে ওর মায়ের সঙ্গে। তাই ওদিকে মন দেয়ার ইচ্ছাই হলো না। এক সময় চলচ্চিত্রের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলাম। মনে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রাবস্থায় বর্তমানে বিআইডিএস-এর ড. হোসেইন জিল্লুর রহমান, ড. আতিউর রহমান, ড. রশীদান ইসলাম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ড. জাহিদ হোসেন, ড. ফাওজুল কবির, বিশ্বব্যাংকের ড. সৈয়দ আক্তার মাহমুদ (ওয়াশিংটন ডিসি), ড. খুরশিদ (ঢাকা), টিউলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মাহমুদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ, ইআরডি এর শাহনূর (শ্যামল), ইউএনডিপি'-র আসাদউল্লাহ, নোরাডের জামিল ওসমান-সহ আমরা আরো অনেকে মিলে গড়ে তুলেছিলাম ইউনিভার্সিটি সিনে সোসাইটি। পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক সতীশ বাহাদুরের কাছে চলচ্চিত্রের ওপর স্বল্পদিনের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছিলাম। সে-সব অনেক পুরনো দিনের কথা। ভিসিআর, ভিসিপি আর ডিশ লাইনের অব্যাহত আগ্রাসনে সুস্থ চলচ্চিত্র-আন্দোলনের ঐসব ছোট ছোট সংগঠনগুলো আজও টিকে আছে কি-না বলতে পারবো না। যা বলছিলাম, সময়ের স্বল্পতার কারণে এমজিএম ষ্টুডিওর চিন্তাটাকেও আপাতত বাদ দিতে হলো। হামফ্রে-ফেলো শফিক ভাইয়ের পরামর্শমতো এপকট সেন্টারকেই বেছে নিলাম। একটা মাত্র দিন হাতে। সারাটা দিন ওখানেই লেগে যাবে। এপকট (EPCOT) শব্দটির প্রকৃত অর্থ Experimental Prototype Communities of Tomorrow। ভবিষ্যত-পৃথিবীর সমাজ ও সভ্যতাকে বর্তমানে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে। অতীতকে আমরা ইতিহাস পড়ে জানি। ভবিষ্যতকে হয়তো-বা নিয়ে আসি কল্পনার মাধ্যমে। কিন্তু এখানে কল্পনার সাথে বিজ্ঞান-ভিত্তিক গবেষণার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর চিন্তাভাবনার পর তৈরি করা হয়েছে আগামী দিনের এই পরীক্ষামূলক সমাজ। টিকেট কাউন্টার থেকে মনোরেইল-এ চেপে এপকট সেন্টারে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় দশটা বেজে গেছে। এখানে রয়েছে দু'টো অংশ: ফিউচার ওয়ার্ল্ড এবং ওয়ার্ল্ড শোকেস। ফিউচার ওয়ার্ল্ডে রয়েছে বিশাল আকৃতির একাধিক প্যাভিলিয়ন। এক-একটি প্যাভিলিয়নে ভবিষ্যত পৃথিবীর এক-একটি দিককে জীবন্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। আর্থ স্টেশন, কমিউনিকো ইস্ট, কমিউনিকো ওয়েস্ট, ইউনিভার্স অব এনার্জি, ওয়ান্ডার অব লাইফ, হোরাইজন, ওয়ার্ল্ড অব মোশন, জার্নি ইনটু ইমাজিনেশন, দি লিভিং সী, দি ল্যান্ড, ইত্যাদি সব কমপ্লেক্সে আগামী দিনের পৃথিবীকে আজকের দর্শকের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, যাকে চোখ দিয়ে দেখা যায়, হাত দিয়ে ছোঁয়াও যায়। কিন্তু অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে। কোনো-কোনো কমপ্লেক্সে আবার

www.pathagar.com

অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যত এই তিন কালকেই উপস্থাপন করা হয়েছে জীবন্তভাবে। যেমন, ওয়ার্ল্ড অব মোশন শুরু হয়েছে পায়ে-হাঁটা একজন ক্লান্ত পথিককে দিয়ে, যে অনেকটা পথ হাঁটার পর পায়ের ব্যাথা সারাতে পায়ের তালুতে অনবরত ফু দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে গরু, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল, চাকা গাড়ি, মোটর গাড়ি, উড়োজাহাজ, ইত্যাদির পর শেষ হয়েছে আগামী শতাব্দীর সম্ভাব্য যাহবাহনের ডিসপ্লে দিয়ে। আগামী শতাব্দীর মানুষের জীবনযাত্রাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে হোরাইজন-এ। ওয়াল্ডার অব লাইফ-এ দর্শককে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে একজন মানুষের শরীরের ভেতর। ভেতরে ঢোকার সময় অনুভব করতে হবে প্রচন্ড ঝাঁকুনির। তাই দূর্বল চিত্তের কারো পক্ষে ওখানে না ঢোকাই বুদ্ধিমানের কাজ। দি লিভিং সী-তে ঢুকলে অনুভব করা যাবে সমুদ্রের তলদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। আবার আর্থ স্টেশন নিয়ে পাড়ি দেবে মহাকাশে, দর্শক উড়ে যাবে মহাবিশ্বের অন্য কোন গ্রহের উদ্দেশে, পাশ দিয়ে উড়ে যাবে তারকারাজি কিম্বা কোনো উল্কাপিন্ড। কোনো একটা প্যাভিলিয়নে যেন দেখলাম ডায়নাসোরস-এর যুগ হতে শুরু ক'রে আধুনিক যুগের ক্রমবিকাশ পর্যন্ত পৃথিবীর ভৌগলিক অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। সবগুলো প্যাভিলিয়নই তৈরি করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক পবেষণা আর কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে। জার্নি ইনটু ইমাজিনেশন দর্শককে নিয়ে যায় কল্পরাজ্যে। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সব ধরনের অনুভতির স্বাদই পাওয়া যায় এই প্যালিভিয়নটিতে। সবগুলো প্যাভিলিয়নেই আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে অদ্ভুত মুন্সিয়ানার মাধ্যমে। সবগুলো প্যাভিলিয়ন ভালোভাবে দেখতে গেলে বোধ হয় কয়েক দিন পার হয়ে যাবে। মানুষের অগ্রযাত্রার ইতিহাসকে তুলে ধারার জন্যে কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংমিশ্রণে লন্ডনের মাদাম তুষোর মিউজিয়ামেও এ-জাতীয় প্রদর্শনী দেখেছি। কিন্তু অরল্যান্ডের এপকট সেন্টারের নানাবিধ প্যাভেলিয়ানের পাশে মাদাম তুষোর প্রদর্শনীকে অনেক নিস্প্রভ ও কম জৌলুসপূর্ণ মনে হবে যে-কারও কাছেই।

এপকট সেন্টারের মাঝখানে রয়েছে বিশাল এক জলাশয় বা কৃত্রিম লেক। ফিউচার ওয়ার্ল্ড অংশ দেখে ওয়ার্ল্ড শোকেস অংশে যেতে হলে জাহাজ চড়ে ওই কৃত্রিম লেক পার হয়ে যাওয়া যায়। অথবা খোলা মঞ্চের-মতো-আকৃতির গাড়ীতে ক'রে যেতে হয়। একটি প্যাভিলিয়ন থেকে আরেকটা প্যাভিলিয়নে যাওয়ার জন্যেও রয়েছে মঞ্চসদৃশ ওই গাড়ীগুলো। যা হোক, দুপুরের পর একটা সময় লেক পার হয়ে এসে পৌঁছলাম ওয়ার্ল্ড শো কেস অংশে। এই অংশে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশ এক একটি প্যাভিলিয়নে নিজ নিজ দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানী, নরওয়ে, জাপান, চীন এবং মরক্কোর প্যাভিলিয়ন ঘুরলে সারা বিশ্ব সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় বৈকি। কোন-কোন দেশের প্যাভিলিয়নে ঐ দেশ সম্পর্কে আবার প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মেক্সিকোর প্যাভেলিয়নটি একবারেই ব্যতিক্রম-

www.pathagar.com

ধর্মী, এক কথায় অপুর্ব। ছোট ডিংঙি নৌকা ক'রে আলো-আধাঁরির মধ্যে মেক্সিকোর পাহাড় আর বনাঞ্চল দেখার এক সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। দেশটিতে পোপোকাটেপেটল, ঈসতাসী ও আতাল, ওরিযাবা, পেরিপেতিন, ইত্যাদি সব সুউচ্চ আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ছোট ঐ প্যাভিলিয়নটিতে কয়েকটি ছোটছোট আগ্নেগিরিও তৈরি করা হয়েছে ঐ গুলোর স্মরণে। পাহাড়, বনাঞ্চল, নদী আর আগ্নেগিরির গর্জনের মাঝে তৈরি করা হয়েছে ছোট একটি রোস্তাঁরা, রোস্তোঁরার নানারূপ সাজসজ্জা, স্তম্ভ, পাথরের মূর্তি, দেয়ালচিত্র, বাসন-কোসন, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলোর ব্যবস্থা, ইত্যাদির মাধ্যমে ওই দেশের প্রাচীন ইন্ডিয়ান সভ্যতাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মেক্সিকোই ছিলো প্রাচীন মায়া, টলটেক, আজটেক, মিকসটেক ও যেপোটেক-সভ্যতার কেন্দ্র। মোমবাতির আলো-আধাঁরে অনেক পর্যটক ব্যতিক্রমধর্মী এই রেস্তোঁরাতে ম্যাক্সিকান ফুড দিয়ে রসনা-পরিতৃপ্তি করছে। এগুলো দেখা শেষ করে যখন হোটেলে ফিরছি তখন হঠাৎ মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মনটা খারাপ হলো এইকথা স্মরণ করে যে, বিশ্ব-সভ্যতায় আমাদের উপ-মহাদেশেরওতো নানাভাবে অবদান আছে। আমরাওতো কয়েক হাজার বৎসরের ঐতিহ্যের অধিকারী। তা হলে বিশ্ব শো-কেসে আমরা অনুপস্থিত কেন? বাংলাদেশ একা না-হোক, সার্কভূক্ত সবগুলো দেশ মিলিয়েও কি একটা প্যাভিলিয়ন তৈরি করা যায় না ? সেটা সম্ভব হয়নি শুধু কি আমাদের অর্থনৈতিক দৈন্যের জন্যে ? নাকি অন্যসব কারণই প্রাধান্য পেয়েছে এ ক্ষেত্রে?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইতিহাস বার বার ফিরে আসে ফিলাডেলফিয়ায়

সাতটা বাজতে-না-বাজতেই গ্লোভার পার্কের বাসার দরজায় জেফরির টোকা। বাঙালিও ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে পারে, জেফরিকে এমন একটা ধারণা দেবার জন্যে কফির কাপটা অর্ধসমাপ্ত রেখেই ব্যাগহাতে বের হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে। তিন ঘন্টার সফল ড্রাইভিং সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই আমাকে ফিলাডেলফিয়ায় নিয়ে এসে উপস্থিত। আসার পথে মেরিল্যান্ড এবং ডেলাওয়ার রাজ্য দু'টি মাড়িয়ে এসেছি। ডেলওয়ার রাজ্যটিতে কোনোরূপ বিক্রয়-কর নেই। তাই কম পয়সায় খাবার লোভে পথে আবার কয়েক মিটিটের যাত্রা বিরতি। ওয়ালনাট স্ট্রিট-এর হলিডে ইন-এ চেক-ইন করিয়ে ছুটলাম চেস্টনাট স্ট্রীট-এর আইআরএস অফিসে। ফিলাডেলফিয়ায় আসার মূল উদ্দেশ্য ইনল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিসের মিড-আটলান্টিক রিজিওনাল অফিস দেখা। ডিসি থেকে গাড়ি চালিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে আসার দায়িত্ব পেয়েছে IRS-এর Tax Administration Avisory Service এর Jeffry C. Rozwadowski। পোলিশ বংশোদ্ভূত এই আমেরিকান যুবকের নামটা পুরোপুরি পোলিশ হলেও ওরা পাঁচ পুরুষ ধরে আমেরিকান। ইতিহাসের ছাত্র বলেই হয়তোবা আমেরিকার ইতিহাসের প্রতি ওর একটা প্রচন্ড রকম আকর্ষণ রয়েছে। ওয়াশিংটন ডিসি-তে গাড়িতে চেপেই ওর প্রথম মন্তব্য: আজ তোমাকে এমন একটা শহরে নিয়ে যাবো যে-শহর আজকের মার্কিনী জাতিসত্ত্বা নির্মাণে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সারাটা পথ জুড়েই ও এ-দেশের ইতিহাসের নানাদিক নিয়ে আলাপ জমাতে চেষ্টা করলো।

প্রথম দিন IRS-এর স্থানীয় প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী সিনডি সুইটকে এর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে-করতেই প্রায় বিকেল। জেফরি যেন-এর অপেক্ষায় ছিলো। অলি-গলি পথ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাকে বেশ-কিছু পুরাতন ভবনসম্বলিত এক কমপ্লেক্সের সামনে এনে দাঁড় করালো। পুরো এলাকার রাস্তাঘাট এবড়ো খেবড়ো, ছোট ছোট ইট-বিছানো, পাথর-ছড়ানো-যা নাকি আজকের আমেরিকায় একেবারেই বেমানান। এবিষয়ে জেফরির দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ওর তাৎক্ষণিক উত্তর 'স্বাধীনতার সময়টাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে পুরো এলাকা জুড়েই। তাই ঐ সময়কার রাস্তা

www.pathagar.com

ঘাটকেও কোনরূপ পরিবর্তন করা হয়নি এখানে। জেফরি প্রথমেই ঢুকালো ইনডিপেনডেন্স হলে। এই ভবনেই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিলো ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬। এখানেই এ-দেশের শাসনতন্ত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিলো, ১৭৮৮ সনে। কন্টিনেন্ট কংগ্রেস-এর সদস্যরা যে কক্ষটিতে বসে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সে-কক্ষটিকে ঐ ভাবেই রেখে দেওয়া আছে; সামান্যতম পরিবর্তনও আনা হয়নি। কংগ্রেস-র যে-সদস্য যে-চেয়ারটিতে বসেছিলেন, যে-পালকের কলম দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণায় স্বাক্ষর দেওয়া হয়েছিলো, যে-সবুজ কাপড় খন্ডগুলো টেবিলে পাতা ছিলো, সব আজও তেমনি অক্ষত অবস্থায় আছে। কাছেই রয়েছে লিবার্টি-বেল। স্বাধীনতা ঘোষণা করেই এ বেলটা বাজানো হয়েছিলো। বেলটার নীচের দিকের একটা অংশে কিছুটা ফাটল ধরেছে। তবুও মেরামত করা হয়নি অক্ষত অবস্থায় বুলিয়ে রাখা হয়েছে ছোট্ট একটা স্টেজে। অদূরের ঐতিহাসিক Carpenter's hall, city Tavern, ইত্যাদি-ভবনে সংস্কারমূলক কাজ করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু মূল কাঠামোয় কোনোরূপ পরিবর্তন আনা হয়নি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি উদাসীন মার্কিনীরা হাল আমলে এসব বিষয়ে নজর দিচ্ছে বেশ। গেটিসবার্গ, বোস্টন, উইলিয়ামসবার্গ, ফিলাডেলফিয়া, ইত্যাদি ঐতিহাসিক স্থান দেখার সময় তা অনুভব করা যায়। তা ছাড়া ভাইকিং কিম্বা কলম্বাসের সময়কে শুরু না-ধরে নেটিভ ইন্ডিয়ানদের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে মার্কিনী সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করার একটা প্রবণতাও রয়েছে। তবে ঐতিহাসিকভাবে ফিলাডেলফিয়া তথা সমগ্র পেনসিলভানিয়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসত্ত্বা নির্মাণে এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই এ দেশের ইতিহাস সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে গেলেও বারবার ফিরে আসতে হবে ফিলাডেলফিয়ায়।

আমেরিকা মহাদেশ সর্ব প্রথম কে আবিস্কার করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রাবস্থায় ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নামই বলে ফেলেছি। উত্তরটি এক অর্থে সঠিক হলেও অন্য অর্থে বোধ হয় সঠিক নয়। কারণ কলম্বাসের বহু পূর্বেই সভ্য জগতের মানুষ পদার্পণ করেছিলো নতুন এই ভূখন্ডটিতে। আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ এর আইসল্যান্ড দেশীয় ভাইকিংরা লিয়েফ এরিকসন নামের এক নাবিকের নেতৃত্বে আটলান্টিক পারি দিয়ে আমেরিকার উত্তর উপকূলে পদার্পণ করতে পেরেছিলো। কিন্তু সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে ভাইকিংরা মূল ভূখন্ডের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে। এরিকসন ও তার সাথী ভাইকিংদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিলো আজ তা বলা মুশকিল। ভাইকিং অভিযানের প্রায় পাঁচশ বছর পর কলম্বাসের নেতৃত্বে আরেক দল ইউরোপীয় পথ ভুলে আমেরিকায় নোংগর ফেলে। ইটালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস (অনেকেই কলম্বাসকে পর্তুগীজ নাবিক বলে ভুল করে থাকেন) পর্তুগীজ রাণীর আর্থিক সহায়তা লাভ করে ভারতবর্ষে পৌঁছার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলো ১৪৯২ সনে। মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিশেষত এশিয়া হতে মশলা, কাপড়, রঙ ও স্বর্ণ আমদানী। কলম্বাস ইউরোপ হতে পশ্চিমে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের

www.pathagar.com

পরিবর্তে পৌঁছে গেলেন ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত বাহামা দীপপুঞ্জে। কলম্বাস তার কাংখিত দূরপ্রাচ্যে কখনো পৌঁছাতে পারেননি। কিন্তু ক্যারিবিয়ান এলাকা হতে প্রচুর স্বর্ণ পিন্ড নিয়ে ইউরোপে ফিরেছিলেন। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে প্রচুর সংখ্যক ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল আমেরিকার দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলে অভিযান চালায়। তারা পেয়ে যায় এক নূতন পৃথিবীর সন্ধান, যে পৃথিবীতে রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, আর আধুনিক সভ্যতার আলো বঞ্চিত কিছু সহজ-সরল মানুষ। কলম্বাস ভুলক্রমে যাদের নামকরণ করেছিলেন ইন্ডিয়ান। অজানা এই নতুন ভূ-খন্ডের মাঝেই ইউরোপীয়রা খুঁজে পেয়েছিলো সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত গড়ার স্বর্ণালী স্বপ্নের হাতছানি।

স্পেনীয়রাই ফ্লোরিডায় ১৫৬৫ সালে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলো। ইংরেজরা প্রথম বসতি স্থাপন করে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ার জেমস টাউন এ। ভার্জিনিয়ার বসতি স্থাপনকারীদের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিলো তামাক যা পরবর্তীকালে এমনকি অদ্যাবধি ভার্জিনিয়ান তামাক হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। আমেরিকার উত্তর পূর্ব অঞ্চলের নিউ ইংল্যান্ডেও ইংরেজরা বসতি স্থাপন করে। ম্যাচাচুসেটস (১৬২০), বোষ্টন (১৬৩০) এবং কানেকটিকাট (১৬৩৫) এর বসতিগুলি মূলত স্থাপিত হয় ইংরেজ মৌলবাদিদের দ্বারা যারা ইংল্যান্ডের চার্চ কর্তৃক গৃহীত কতিপয় ধর্মীয় রীতি নীতির বিরোধিতা করে কর্তৃপক্ষের কু-নজরে পড়েছিলো। রাষ্ট্র এবং ধর্মের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত নয় এই নীতিতে বিশ্বাসী রজার উইলিয়ামকে ম্যাচাচুসেটস ভ্যালি ত্যাগ করে রোড আইল্যান্ডে পৃথক বসতি স্থাপন করতে হয় ১৬৩৫ সালে। রোমান ক্যাথলিকরা মেরিল্যান্ডে এ বসতি স্থাপন করে ১৬৩৪ সালে। পেনসিলভানিয়াতে আরেকটি ধর্ম নিরপেক্ষ গ্রুপের বসতি গঠিত হয় ১৬৮১ সালে। উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ কলোনীগুলোতে অন্যান্য ইউরোপীয়রাও বসতি স্থাপন করে। যেমন পেনসিলভানিয়াতে জার্মান কৃষক বসতি, ডেলাওয়ারে সুইডিস কলোনী, নিউ আর্মস্টারডামে ডাচ বসতি (১৬২৬) যা নাকি ১৬৬৪ সালে ইংরেজরা দখল করে নিয়ে নতুন নামকরণ করে নিউইয়র্ক। পেনসিলভানিয়ার উইলিয়াম পেন ছিলেন উদারনৈতিক Religious Society of Friends (Quaker)-এর সদস্য। তাই তিনি তাঁর পেনসিলভানিয়ায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজ গঠন করতে পেরেছিলেন।

১৭৩৩ সালের মধ্যে আটলান্টিক উপকূলের তেরোটি কলোনী ইংরেজ শাসনভুক্ত হয়। ইংল্যান্ডের রাজা ঐ-সব কলোনীর শাসক নিযুক্ত করতেন, তবে শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের অবকাশ ছিলো। ভূমির মালিক শ্বেতকায় পুরুষরাই ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ভূমিকে কেন্দ্র করে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেনী গড়ে উঠার কোনো অবকাশ হয়নি এখানে। আটল্যান্টিক উপকূলে উত্তরে নিউহাম্পশায়ার হতে দক্ষিণে জর্জিয়া পর্যন্ত তেরোটি কলোনী ইংরেজ অধিকারভুক্ত থাকলেও কানাডা এবং লুইজিয়ানা (অর্থাৎ মিসিসিপি নদীর সমগ্র উপকূল) ছিলো ফরাসী অধিকারভুক্ত। ১৬৮৯ হতে ১৮১৫ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ভূমির অধিকার নিয়ে।

www.pathagar.com

১৬৮৯ সনে প্যারিসে এক শান্তি চুক্তির ফলে কানাডা এবং মিসিসিপি নদীর পূর্বে অবস্থিত সমগ্র উত্তর আমেরিকা ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়। এসব সন্ধি কিংবা চুক্তির মধ্যে স্থানীয় আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের কোনো অংশগ্রহণ ছিলো না। তাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই তাদেরকে অনবরত যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে বিভিন্ন ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারিদের বিরুদ্ধে।

প্যারিস চুক্তির পর ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আর যুদ্ধ না করার নীতি নিয়ে ব্রিটেন এ্যাপালাশাইন পর্বতমালার পশ্চিমে নতুন বসতি স্থাপন নিষিদ্ধ করে। তার ওপর চিনি, কফি, কাপড় এবং আমদানী দ্রব্যের ওপর করারোপ করে। কোয়ারটারিং আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সৈন্যদের আহার ও বাসস্থানের দায়িত্ব বর্তায় স্থানীয় জনসাধারণের ওপর। ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট এর মাধ্যমে সকল প্রকার দলিলপত্রাদি, সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, লাইসেন্স ইত্যাদির ওপর ষ্ট্যাম্প সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সরকার কর্তৃক কর আরোপের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও সকল সমাজেই কর প্রদান একটি অপ্রিয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সভ্যতার উষালগ্ন হতে অদ্যবধি এর কোনোরূপ ব্যতিক্রম নেই। নতুন নতুন করারোপ নুতন বসতি স্থাপনকারিদের ব্যবসায়িক স্বার্থের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বৃটিশ সৈন্যের স্থায়ী উপস্থিতিও তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে বলে ভাবতে থাকে। ১৭৬৫ সালে নয়টি কলোনীর প্রতিনিধিগণ ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট কংগ্রেসে নতুন করের বিরোধিতা করে বিলেতি দ্রব্য বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানায়, ষ্ট্যাম্প ব্যবহার বন্ধ করা হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার ষ্ট্যাম্প এ্যাক্ট তুলে দিতে বাধ্য হয় এবং চায়ের ওপর ব্যতীত সকল নুতন কর রহিত করে। কিন্তু ততোদিনে জল অনেক গড়িয়ে গেছে। ১৭৭৩ সালে একদল ম্যাচাচুসেটস্‌বাসী বোস্টন বন্দরে অবস্থিত জাহাজে চড়ে ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে ৩৪২ পেটি চা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে দৃশ্যত বিদ্রোহের সূচনা করে। বোস্টন শহরের বন্দরে ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে এখনো ওই জাহাজটি রেখে দেয়া আছে। বোস্টন শহর পরিভ্রমণের সময় টুরিস্ট গাইড গর্বভরে ঐ চা বিদ্রোহের কথা বলছিলো বার বার করে। বোস্টন বন্দরের ঘটনার পর বিট্রিশ পার্লামেন্ট 'ইনটোলারেবল এ্যাক্ট' পাশ করে এবং বোস্টনে বিট্রিশ সৈন্য প্রেরণ করে। অপরদিকে ১৭৭৪ সনে সকল কলোনীয়াল নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হয় ঐতিহাসিক ফিলাডেলফিয়ায়। তারা ইনটোলারেবল এ্যাক্ট অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেয়, সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ শুরু করে। ১৯ এপ্রিল ১৭৭৫, একদল ব্রিটিশ সৈন্য বোষ্টন শহরের অদূরে লেক্সিনটন নামক স্থানে বিদ্রোহীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এখান থেকেই সম্ভবত আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের সূত্রপাত। মে, ১৭৭৫ এ ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর জর্জ ওয়াশিংটন এর নেতৃত্বে জাতীয় সরকার তার কার্যক্রম শুরু করে। টমাস জেফারসনের নেতৃত্বে লিখিত হয় আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা। ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ সালে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ ঘোষণা অনুমোদন করে, লিবার্টি বেল বাজিয়ে ঘোষণা

www.pathagar.com

করা হয় আমেরিকার স্বাধীনতা। ফিলাডেলফিয়া শহরে আজও অক্ষত অবস্থায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে আমেরিকার ইতিহাসের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ঐ ঐতিহাসিক স্থানগুলো ও নিদর্শনগুলো।

যুদ্ধের প্রথম দিকের হাওয়া ব্রিটিশ শক্তির অনুকুলেই বইতে শুরু করে। সেপ্টেম্বর, ১৭৭৬ এ নিউইয়র্ক এবং ১৭৭৭ এ ফিলাডেলফিয়া ব্রিটিশ অধিকারে চলে যায়। ফ্রেব্রুয়ারি, ১৭৭৮ সনে জর্জ কর্ণওয়ালিশের নেতৃত্বে আট হাজার ব্রিটিশ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ভার্জিনিয়ার ইয়ার্কটাউন এ ফ্রান্স-মার্কিন যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমপর্ন করে। এই সেই জর্জ কর্নওয়ালিশ যিনি পরবর্তীকালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ নামে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভাইস রয় হিসেবে ভারতবর্ষ শাসন করেন। ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে চালু করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যার ফলে ভূমিকে কেন্দ্র করে এদেশে উদ্ভব হয় এক নুতন অভিজাত শ্রেনী-জমিদার যার নাম। এদের সন্তানেরাই পরবর্তীকালে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এদেশে সৃষ্টি করে নতুন এক সমাজ। মূলতঃ কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। যা বলেছিলাম, কর্ণওয়ালিশের আত্মসমর্পণের পর ব্রিটিশ সরকার শান্তির প্রস্তাব উপস্থাপন করে। ১৭৮৩ সনে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকার স্বাধীনতার দাবি মেনে নেওয়া হয়। ফ্লোরিডার উত্তরে কানাডার দক্ষিণ এবং মিসিসিপি নদীর পূর্ব অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় নুতন স্বাধীন রাষ্ট্র।

১৭৮৩ এর প্যারিস ট্রিটির পর ১৩টি কলোনী স্বাধীনতা লাভ করেছে সত্য কিন্তু তখনো প্রকৃত পক্ষে এক রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারেনি। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার ছিল বটে, কিন্তু প্রতিটি রাজ্যই মূলতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় চলছিলো। মে, ১৭৮৭ এর ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে শুধুমাত্র আর্টিকেল অব-কনফেডারেশন রিভাইজ করার কথা। জর্জ ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং জেসম মেডিসন এই তিন নেতা একটি কার্যকর শাসনতন্ত্র তৈরী ও উপস্থাপন করেন। যে শাসনতন্ত্রে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং আইন সভা, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য' এর নিশ্চয়তা প্রদান করে। ১৭৮৮ সনে নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। কিন্তু রাজ্যগুলোকে আরো অধিক শায়ত্বশাসন প্রদানের সমর্থকদের দাবীর মুখে ১৭৯১ সালে শাসনতন্ত্রে সংযোজিত হয় 'দি বিল অব রাইটস' যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্থান দেয়া হয় সবার ওপরে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধের মাধ্যমে, স্বেচ্ছায় একত্রিভূত হওয়া, ভূমি ক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সীমা বাড়তে থাকে, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয়, এশীয় ও আফ্রিকান নাগরিকও ভাগ্যের অন্বেষণে পদার্পণ করতে থাকে নুতন এ ভু-খন্ডে। ইতিমধ্যে ইউরোপে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিস্কারের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। তার ঢেউ এসে লাগতে শুরু করেছে এই নতুন দেশটিতেও। দক্ষিণের রাজ্যগুলো ছিলো মূলতঃ কৃষি নির্ভর। আফ্রিকা থেকে জোর

www.pathagar.com

করে ধরে নিয়ে আসা কালো মানুষকে ব্যবহার করা হতো ঐ সব কৃষি জমিতে ফসল ফলানোর জন্যে। ঐ সব কালো মানুষের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফলে সোনালী ফসলে ভরে উঠতো দক্ষিণের রাজ্যগুলোর গোলাভান্ডার। আর উত্তরের রাজ্যগুলোতে তখন শিল্পের বিকাশ ঘটছে। কৃষি, বাণিজ্য এবং লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহীত পুঁজি তার বিকাশ চাচ্ছে। তাই অধিক মুনাফার আশায় স্থাপিত হচ্ছে শিল্প কারখানা; কিন্তু তার জন্যে শ্রমের প্রয়োজন। শ্রমই সৃষ্টি করতে পারে বাড়তি মূল্য বা মুনাফা। ইউরোপ বা বাইরে থেকে শ্রমিক আনা ব্যয়সাধ্য। অপরদিকে দক্ষিণের খামারগুলোতে দাস হিসেবে আটকে আছে বিপুল সংখ্যক কালো শ্রমিক। অমানবিক দাস প্রথা তুলে দিয়ে ওইসব শ্রমিককে শৃঙ্খলমুক্ত করতে পারলে তাদেরকে নিয়োগ করা যায় উত্তরের শিল্প কারখানায়। শাসনতন্ত্র রচনার সময় থেকেই উত্তর আর দক্ষিণের রাজ্যগুলোর মধ্যে এই নিয়ে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিলো। টমাস জেফারসন নিজে দাস মালিক হয়েও দাস প্রথার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিলেন শাসনতন্ত্রের প্রথম খসড়াতে। কিন্তু পরে তা বাদ দিতে হয়েছিলো অন্যান্য দাস মালিকদের চাপে পড়ে।

১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন মূলতঃ উত্তরের রাজ্যগুলোর ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব হতেই তিনি দাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিলেন। এই দাস প্রথা বিদ্যমান থাকার কারণে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার অমর বাণী That all men are created equal পনের লক্ষ দাসদের জীবনে অর্থহীন হয়ে থাকছিলো। নির্বাচনের পর দাস প্রথা উচ্ছেদ এর বিষয়টি প্রাধান্য পায়। কিন্তু লিঙ্কন নির্বাচিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দক্ষিণ ক্যারোলিনা যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। তার সঙ্গে যোগদান করে মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, আলাবামা, জর্জিয়া, লুইজিয়ানা, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, আরকানশা, টেনিসি এবং উত্তর ক্যারোলিনা। এই ১১টি রাজ্য নিজেদেরকে পৃথক জাতি হিসেবে ঘোষণা করে গঠন করে Confederate States of America। শুরু হয় আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধে অবস্থানগত দিক দিয়ে সুবিধাজনক স্থানে থাকা সত্ত্বেও কনফেডারেটগণ উত্তরের ইউনিয়নিস্টদের অপেক্ষা সংখ্যায় ছিলো কম। তাছাড়া উত্তরের শিল্প বিকাশের কারণে প্রযুক্তিগত সুবিধা ছিলো ইউনিয়স্টিদের পক্ষে। যুদ্ধের প্রথম দিকে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ১৮৬৩ এর গ্রীস্মে জেনারেল রবার্ট ই, লী গেটিসবার্গের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে যুদ্ধের মোর ঘুরে যায় ইউনিয়ানিস্টদের পক্ষে। ২রা এপ্রিল ১৮৬৫, জেনারেল লী কনফেডারেটিদের রাজধানী ত্যাগ করে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জেনারেল গ্রান্ট এর কাছে আত্নসমর্পণ করেন। শেষ হয়ে যায় আমেরিকার গৃহযুদ্ধ।

কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন কয়েকদিন পর ১৪ এপ্রিল নিহত হন ওয়াশিংটন ডিসি এর ফোর্ড থিয়েটারে। ওই থিয়েটারটি লিঙ্কনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এখনো সংরক্ষিত রাখা আছে অক্ষত অবস্থায়। আর গেটিসবার্গের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তৈরী করা হয়েছে এক কমপ্লেক্স, যেখানে হয়েছে যাদুঘর, সিনেমা হল, দেয়াল চিত্র, কবরস্থান। ইলেকট্রিক ম্যাপ এ সেই সময়কার ইউনিয়ন

www.pathagar.com

ফোর্স এবং কনফেডারেট ফোর্স এর অবস্থান এবং রণকৌশলকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গেটিসবার্গ স্থানটি অন্য আরেকটি কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে। লিঙ্কন এখানে তার বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন ওই ভাষণেই উল্লেখিত হয়েছিলো তার বিখ্যাত উক্তি Government of the people, by the people and for the people। লিঙ্কনের মৃত্যু হলেও যুদ্ধের পর দাস প্রথা রহিত করা হয়; যা নাকি পূর্ণতা পায় ১৮৬৫ সালে শাসনতন্ত্রের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে।

পরদিন ফিলাডেলফিয়া থেকে ফেরার পথে গাড়িতে জেফরির সঙ্গে আলাপ হচ্ছিলো আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে। মাত্র তেইশ বছর পূর্বে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক স্মৃতিই আজ হারিয়ে গেছে। ইতিহাস বিকৃতির প্রতিযোগিতা চলছে যেনো আমাদের দেশে। অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়েও যেনো আমাদেরকে বার বার পেছনে ফিরে তাকাতে হয়। আমার কথায় কোথায় যেনো একটু হতাশার সুর খুঁজে পাচ্ছিলাম নিজেই। হঠাৎ করেই আবার মনে পড়লো USAID এর ডেভিড ফ্রেডরিকের বলা কয়েকদিন পূর্বের কথাগুলো। 'বিশ-পঁচিশ বছর একটা জাতির জন্যে কিছুই না। ভুলে যাচ্ছ কেনো, আজকের যুক্তরাষ্ট্র পাবার জন্যে আমাদেরকে দু'শ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তোমরা অবশ্য শুরু করেছ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে, নতুন প্রযুক্তির যুগে, তাই সময় তোমাদের কাছে থেকে দু'শ বছর না পেলেও অন্তত তার সিকি ভাগ তো দাবি করতে পারে।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বোস্টন: আধুনিক মার্কিনী সভ্যতার উন্মেষস্থল

ন'টার গাড়ি ক'টায় ছাড়বে? এদেশে এসে অনেকবারই এ-জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু এ-যাত্রায় নির্ধারিত প্যাট্রিয়ট ১৭২ সকাল ন'টা বিশেই ইউনিয়ন স্টেশন ত্যাগ করলো। ট্রেনটি সন্ধ্যা ছ'টায় আমাকে বোস্টন সাউথ স্টেশনে নামিয়ে দেবে। মেরিল্যান্ড, ডেলাওয়ার, পেনসিলভানিয়া, নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক, কানেকটিকাট, রোড আয়ল্যান্ড–এই সাত-কন্যার নানা অঙ্গের স্পর্শ নিয়ে, কখনোবা কারো বুক চিরে, প্যাট্রিয়ট যখন ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যে প্রবেশ করবে তখন বিকেল পাঁচটা পেরিয়ে যাবে। পাশের সিটের প্রতিবেশী এক নীল-নয়না, মায়াবী ব্লন্ড চুলের অধিকারিণী। ভাবলাম, যদি জমিয়ে ফেলতে পারি তবে সময়টা ভালোই কাটবে। কিন্তু হায়! মুখ ও বুকের ওপর একটা বই ধরে রেখে সারাটা পথ ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলো নীরস সুন্দরী। প্রায় সারাদিনের সহযাত্রী, অথচ একমাত্র 'হাই' বিনিময় ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি ওর সঙ্গে। তিনটের দিকে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে কিছুটা পরিপাটি, সফ্‌ট্‌ড্রিঙ্ক সহযোগে মাফিন খেতে খেতে আমার দিকে তাকিয়ে একটু কৃত্রিম হাসি—

: তুমি কি বোস্টন পর্যন্তই যাচ্ছ?

: হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ?

: আমি আর একটু পরেই নেমে যাবো Mystic স্টেশনে।

: তোমার স্টেশনের নামটা সুন্দর, ব্যতিক্রমধর্মী, কিন্তু বিশেষ অর্থবহ কি?

: তোমার চেহারা এবং কথার উচ্চারণে ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে। এ জন্যেই মিস্টিক শব্দটি তোমার ভালো লাগালো কি-না বুঝতে পারছি না।

: দুঃখিত, আমি ভারতীয় নই। আমি বাংলাদেশের মানুষ, ভারত আমার প্রতিবেশী দেশ।

: ঠিকই ধরেছি আমি। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-সাধনার জন্যে তোমাদের উপমহাদেশের খ্যাতি কেনা জানে? আমার খুব ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবীর দাদা মুসোলিনির সৈন্য হিসেবে ভারতীয় জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁর কাছে তোমাদের অঞ্চলের Mysticism নিয়ে গল্প শুনেছি। আমার এক বন্ধুরও আগ্রহ আছে এই বিষয়ে। তুমি কি এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখ? তা হলে আমার ঐ বন্ধুকে তোমার কথা বলতে পারি।

www.pathagar.com

মনে পড়লো গ্রীক সহপাঠিনী থিওডোরার কথা। ও একাধিকবার আমাকে মিস্টিকবাদ, সুফীবাদ, বৌদ্ধের দর্শন, ইত্যাদি নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করেছে। এই বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু ডোরার কোনো প্রশ্নেরই ঠিক উত্তর দিতে পারিনি। এবারও সবিনয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে স্বস্তি পেলাম যেন। তবে আলাপটা চালিয়ে নেওয়ার জন্যেই বললাম—

: আমার সীমিত-জ্ঞান মতে মিস্টিকবাদ-এর অস্তিত্ব সকল অঞ্চলে এবং সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই রয়েছে। সে দিক থেকে স্টেশনটির নামকরণের মধ্যে বাস্তবসম্মত কোনো কারণ রয়েছে নিশ্চয়ই?

: স্টেশনটির নামকরণের ইতিহাস আমি বলতে পারবো না, তবে খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের মধ্যেও মিস্টিক গ্রুপ রয়েছে বলে জানি। সেন্ট অগাসটিন, সেন্ট গ্রেগরি, হিউ অব সেন্ট ভিক্টর খ্রীষ্টধর্মের কয়েকজন বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী। ইহুদীদের মধ্যে ক্যাবালা এবং হাদিসীম সম্প্রদায়ও মর্মবাদী। প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যে কোয়েকারগণও মিস্টিকবাদ প্রচারের চেষ্টা করেছে।

বুঝতে পারলাম এই বিষয়ে ওর জ্ঞানের পরিধি আমার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশি। কি বলতে কি বলে ফেলি এই ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও আমাদের মরমী গান এবং সাধক লালন ফকিরের প্রসঙ্গে আমার ভাসা-ভাসা জ্ঞান দ্বারা ওকে কিছু বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু উপমহাদেশের সংগীতের বিষয়ে ও শুনেছে সত্যি, কিন্তু লালন-ফকিরের নাম এর আগে কখনো শুনেছে বলে মনে করতে পারলো না। দেখতে দেখতে ওর গন্তব্যস্থল চলে এসেছে। নামার জন্যে হাত-ব্যাগের ফিতেয় হাত রেখেছে।

: কথা হলো, নামটি জানা হলো না তোমার।

: আমার নাম 'ইভনিং'। হ্যাভ এ সেফ এন্ড নাইস জার্নি।

হাত মিলিয়ে হাসি বিনিময়ের পর ইভনিং মিস্টিক-এ নেমে গেল যথারীতি। ওর এবারের হাসিটাকে মোটেও কৃত্রিম মনে হলো না আমার । ওর গন্তব্য স্থান এবং ওর নামের মতো ওকেও আমার কাছে কেন জানি না, একটু ব্যতিক্রমধর্মী মনে হলো। বারবার মনে হতে লাগলো, ইভনিং-এর সঙ্গে আর কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে বোধ হয় ভালো লাগতো।

বোস্টন সাউথ থেকে পাতাল টি ট্রেইন-এর রেডলাইন ধরে হার্ভার্ড স্কোয়ার। ওপরে নজরুল দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক নজরুল ইসলাম তখন হার্ভার্ডে পিএইচডি করছে। এক সময়ের সহপাঠি, বন্ধু; কিছুদিন সহকর্মীও ছিলাম কৃষি মন্ত্রণালয়ের সেচ-গবেষণা প্রকল্পে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন। নজরুলের স্ত্রী বিআইডিএস-এর খালেদা নাজনিনও ওয়ালথামের Brandwise বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির ছাত্রী। স্ত্রী এবং পুত্র রাহুলকে নিয়ে নজরুলের ছোট্ট সংসার। চার্লস নদীর তীর ঘেষে Brandwise ক্যাম্পাসের ছোট্ট বাসায় ওদের উষ্ণ আতিথেয়তায় দু'দিন বেশ ভালোই কেটেছে।

www.pathagar.com

বোস্টনে আসার মূল উদ্দেশ্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড বার্ড-এর দেওয়া এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করা। পাউন্ড হলের আইটিপি স্কুলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অধ্যাপক রিচার্ড বার্ড, অধ্যাপক গ্লেন জেনকিন-সহ অনেক খ্যাতিমান ব্যাক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। লাঞ্চের পর সেমিনার শুরু হওয়ায় সকালটা ফ্রি পেয়েছিলাম এদিক সেদিক ঘুরে দেখার জন্য।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি পুরনো কিন্তু ঐতিহ্যমন্ডিত। প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই ১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে চার্লস নদীর তীরে হার্ভার্ড কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মি. হার্ভার্ড। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে হার্ভার্ডের নতুন প্রেসিডেন্ট চার্লস এলিয়ট কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত ক'রে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় তিনশ বছর ধরে চার্লস নদীর দুই তীরে বোস্টন ও ক্যামব্রিজ শহর জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছে। বাস্তব কারণেই ক্যাম্পাস অনেকটা এলোমেলো, অগোছালো এবং সেকেলে ধাঁচের। আয়তন এবং সৌন্দর্যের বিচারে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনা অবান্তর। ক্যাম্পাসের নানাদিক ঘুরে একসময় এসে দাঁড়ালাম জন হার্ভার্ডের স্ট্যাচুর কাছে। পুরনো একটা দালানের পাশে খোলা আকাশের নীচে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে স্থাপিত রয়েছে স্ট্যাচুটি, কোনো আড়ম্বর নেই, নেই কোনো অলঙ্করণ। জন হার্ভার্ডের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে বইতে পড়া একটা সত্য ঘটনা মনে পড়লো। নির্বাচনে জয়লাভের পর ১৮৩৩ সনে প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জ্যাকসনকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো হার্ভার্ড থেকে। জ্যাকসনের সঙ্গে নির্বাচনে পরাজিত পূর্ববতী প্রেসিডেন্ট জন কুইনসি এ্যাডামস্ ছিলেন হার্ভার্ডের নামকরা ছাত্র, কলেজ-জীবনেও তিনি কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্যে ১৭৮৭ সনে হার্ভার্ড কলেজে Phi Beta Kappa নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে জে,কিউ, এ্যাডামস্ কর্তৃপক্ষকে একটা-চিঠি দিয়েছিলেন, যার অংশ বিশেষ নিম্নরূপ—

> As myself an affectionate child of our alma mater, I would not be present to witness her disgrace in conferring her highest literary honors upon a babarian who could not write a sentence of grammar and hardly could spell his own name.

একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টের উপরোক্ত মন্তব্যটি কি সত্যিকার অর্থেই ব্যতিক্রমধর্মী নয়?

ক্যাম্পাস থেকে বের হলেই হার্ভার্ড স্কোয়ার। ওখানে নিত্যদিন একটা-না-একটা কিছু লেগেই থাকে। ভরদুপুরেই একদল মেতে উঠেছে সংগীত আর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে। রাস্তার এক কোণায় দাড়িঁয়ে আছে সিলভার রঙ-এর এক রোবট। রোবটের ভঙ্গিমায় হাত পা নাড়ছে কখনো বা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কেউ একটা ডলারের নোট এগিয়ে দিলে দুই আঙুলকে কাঁচির মতো বানিয়ে ডলারটি নিয়ে রেখে দিচ্ছে কোমরের ব্যাগে; রোবটের ভঙ্গিমায় হাত তুলে অদ্ভুত গলায় বলছে Thank you।

www.pathagar.com

একেবারে নিখুঁত রোবটের মতো, বেশ মজা পাচ্ছিলাম দেখে। এক সময় ডলারের একটা নোট মেলে ধরলাম ওর দিকে। রোবটের ভঙ্গিমায় হাতটা ওপরে তুলে আবার নামিয়ে নিলো, প্রচন্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রোবটের গলায় বললো 'ধন্যবাদ'। অবাক বিস্ময়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, আপনি কি বাঙালি? কোন রূপ উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো রোবটটি। আমিও ঘুরে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আবার। ও যেন একটু বিরক্ত, আমাকে যেন বলছে, 'হে আমার আপন জন, চলে যাও চলে যাও নিজ কাজে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমার রোজগারে বাধা হয়ে দাঁড়িওনা।' ততোক্ষণে আমার লাঞ্চের সময় হয়ে আসছে। অধ্যাপক বার্ডের সঙ্গে লাঞ্চের নিমন্ত্রণই আমাকে তাড়া দিলো ওই স্থান ত্যাগ করার। যেতে যেতে মনে হলো বেঁচে থাকার তাড়নায় বাঙালী আজ সারাবিশ্ব জুড়ে কতো না বিচিত্র পেশায় জড়িয়ে পড়েছে।

চার্লস নদীর দুই তীর ঘেঁষে বোস্টন এবং ক্যামব্রিজ শহর দু'টি গড়ে উঠেছে। শহর দুটির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে রয়েছে একাধিক ব্রিজ। দু'টি শহরের রাস্তাঘাট দালানকোঠা, বিভিন্ন স্থানের নামকরণ এর মধ্যে অনেক মিল; দুটি শহরের সবকিছুর মধ্যেই যেন বিলেতি ছাপ। এর কারণ খুঁজতে গেলে ইতিহাসের পথ ধরে হাঁটতে হবে সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম ভাগ পর্যন্ত।

১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১০৫ জন অধিবাসী নিয়ে ভার্জিনিয়ার জেমস টাউনে সর্বপ্রথম ইংরেজ বসতি স্থাপিত হলেও ১৬২০ সালে ম্যাসাচুসেট্স- এর প্লিমাউথে নোঙরকারী মে ফ্লাওয়ার-এর অভিযাত্রীদেরকেই এদেশে প্রথম সফল ইংরেজ বসতি স্থাপনকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মে ফ্লাওয়ার-এর অভিযাত্রীরা ছিলেন ধর্মীয় মৌলবাদী এবং ইংল্যান্ডের চার্চকর্তৃক গৃহীত সংস্কারমুলক নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে ম্যাসাচুসেট্স্-এর আশেপাশে আরো কয়েকটি ইংরেজ বসতি গড়ে ওঠে। বর্তমানের পাঁচটি রাজ্য—ম্যাসাচুসেট্স্, রোড আইল্যান্ড, কানেকটিকাট, নিউ হ্যাম্পশায়ার এবং মেইন ও ভারমন্ট ও নিউইয়র্ক রাজ্যের একটা অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটিকে প্রথম থেকেই ডাকা হয় নিউ ইংল্যান্ড নামে।

পুরো অঞ্চলটি পর্বতসঙ্কুল এবং চাষাবাদের জন্যে খুব একটা উপযোগী না-হলেও ঐতিহাসিক কারণে নিউ ইংল্যান্ড আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র নির্মাণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত এই অঞ্চলই ছিলো এদেশের অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখানো নিউ ইংল্যান্ডই যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

জমি কৃষি-উপযোগী না-হওয়ার কারণে ঐতিহাসিকভাবেই অঞ্চলটিতে অন্যান্য পেশাই প্রধান্য পায়। জাহাজ নির্মাণ, মৎস্য আহরণ এবং সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। উনবিংশ শতাব্দির শিল্পবিপ্লবের ঢেউ প্রথমে ম্যাসাচুসেট্স্ থেকেই

www.pathagar.com

শুরু হয়। ম্যাসাচুসেট্স্, কানেকটিকাট ও রোড আইল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়েই গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল। আর এসব শিল্পাঞ্চলের অর্থের যোগান হতে থাকে বোস্টন থেকে। সে সময় বোস্টন হয়ে দাঁড়ায় এ অঞ্চলের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র, এমনকি কারো কারো মতে "The hub of the universe."

এদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অভিযানের ক্ষেত্রেও নিউ ইংল্যান্ডবাসীরা অগ্রসেনার ভূমিকা পালন করে। তারা নতুন ভূমির সন্ধানে দলে দলে পশ্চিমে যাত্রা করলেও নতুন নতুন অধিবাসী এসে এ অঞ্চলের শূন্য স্থান পূরণ করে নেয়। নবাগতরা মুলত আয়ারল্যান্ড, ইতালি ও পূর্ব ইউরোপের হলেও নিউ ইংল্যান্ডের প্রাচীন ঐতিহ্য, বিলেতি সংস্কৃতি কখনো নষ্ট হয়নি, এখনো তার রেশ থেকে গেছে।

এ দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গেও বোস্টনের নাম মিশে আছে নানাভাবে। ইংল্যান্ডের রাজাকর্তৃক আরোপিত চা-করের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন চলে আসছিলো তার সহিংস প্রতিবাদ শুরু হয় বোস্টন থেকে। ১৭৭৩ সালে একদল বোস্টনবাসী নেটিভ ইন্ডিয়ানদের ছদ্মবেশ ধরে বোস্টন বন্দরে একটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক জাহাজে আরোহণ করে এবং ৩৪২ পেটি চা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা এদেশের ইতিহাসে বোস্টন টি-পার্টি নামে খ্যাত। এই ঘটনার পর ইংল্যান্ডের সরকার এই উপনিবেশের জন্যে ইনটলারেব্‌ল্ এ্যাক্ট পাশ করে এবং বোস্টনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। এপ্রিল ১৯, ১৭৭৫; বোস্টন শহরে অবস্থিত সেনাছাউনিতে খবর পৌঁছে যে, নিকটবর্তী কনকর্ড শহরের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছে। সাতশ সৈন্যের বাহিনী রওনা হয় কনকর্ড এর উদ্দেশে। পথিমধ্যে ল্যাক্সিনটন গ্রামে সত্তর জন মিলিশিয়া দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় ব্রিটিশ সেনাদল। এখানেই আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের শুরু বলে ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করেন। জুন মাসের মধ্যেই প্রায় দশ হাজার আমেরিকান সৈন্য বোস্টনে প্রবেশ করে। মার্চ ১৭৭৬ এর মধ্যে বোস্টন শহর সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ-সৈন্যমুক্ত হয়।

পরদিন সকালে বোস্টন সাইট সিয়িং ট্যুর-এর টিকেট কেটে শহর পরিভ্রমণে বের হলাম। কোন একটা স্থানে নেমে থাকা যায়, ঘুরে ফিরে দেখে কোম্পানীর পরবর্তী গাড়িতে পুনরায় ওঠা যায়। ওয়াশিংটন ডিসি-র সিটি-ট্যুরের মতো একই নিয়ম। বোস্টন গার্ডেনে কিছুক্ষণের জন্যে নামলাম। সোনালী সবুজে সাজানো পার্কটির কাজল-কালো জলে শ্বেত শুভ্র হাসের জলকেলি, সে-এক অপূর্ব দৃশ্য। কেনেডি যাদুঘর, বাঙ্কার হিল, টি পার্টি শীপ, ইত্যাদি দেখিয়ে বাসটি নামিয়ে দিলো বোস্টন হারবারে। এখানে মাত্র পাঁচ ডলারের বিনিময়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নৌ-ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। ঢেউ-উদ্বেল সমুদ্রের বুক থেকে বোস্টনের বিশাল আকৃতির সুউচ্চ দালানগুলোকে অপূর্ব লাগছিলো।

বোস্টন থেকে ফিরে আসছি ট্রেনে করেই। নিউ জার্সির প্রিন্সটন থেকে এক মধ্যবয়সী যাত্রী উঠলেন পাশের সিটে। নিজে যেচেই আলাপ জুড়লেন, পেশায় ইনভেস্টমেন্ট

www.pathagar.com

প্রোমোটার অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের কাজে সহায়তাদানকারী। আমার পরিচয় জানার পর ভদ্রলোক একটু রসিকতা করতে চেষ্টা করলেন-

: আমি মর্মন সম্প্রদায়ভূক্ত খ্রিষ্টান। শুনেছি আমার ধর্মের মতো তোমার ধর্মও একাধিক বিবাহ অনুমোদন করে। তোমার স্ত্রীর সংখ্যা কত?

না-হেসে পারলাম না ক্ষণিক-পরিচিতের রসিকতায়। মর্মনদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান তখনো শূন্যের কোঠায়। তাই রুট নাম-এর ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু জানতে চেষ্টা করলাম ওদের সম্পর্কে। পরে আরো কিছুটা জানতে চেষ্টা করেছি এ বিষয়ে। মর্মন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ স্মিথ। ১৮৩০ সালে তিনি দাবি করেন যে, নিউইয়র্কের প্যালমাইরা-য় তার ওপর স্বর্ণফলকে লিখিত এক ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। কিছু সমর্থক জোগাড় করে ওহাইও রাজ্যের কিটল্যান্ডে তিনি এক সমাজ গড়ে তোলেন। কিন্তু অন্যান্য খ্রিষ্টানদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁদেরকে চলে যেতে হয় ইলিনয় রাজ্যের নভু শহরে। ১৮৪৪ সালে স্মীথ জনতার আক্রমণে নিহত হন। নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ইয়ং ব্রিগাম। ব্রিগাম তাঁর দলবল নিয়ে পশ্চিম দিকে চলে যান। ইউটা রাজ্যের গ্রেট সল্ট লেকে বসতি স্থাপন করেন ১৮৪৭ সালে। বিরোধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৮৫৭-৫৮সালে ইউটায় মর্মনদের রিরুদ্ধে সামরিক অভিযানও চালায়। ব্রিগাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে যান, যুক্তরাষ্ট্রের অস্থায়ী সরকারের গভর্নরও নিযুক্ত হন তিনি। বহু বিবাহ প্রথার দরুণ ১৮৮৯ পর্যন্ত ইউটা স্টেট-মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়। ১৮৯০ সালে মর্মন নেতা উইলফোর্ড উডরাফ এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আইন মর্মনদের জন্যেও প্রযোজ্য বলে মেনে নেয়ার পর ইউটা স্টেট-মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীকালে ওয়াশিংটনে যাতায়াতের পথে উজ্জ্বল সোনালী রঙের মিনারযুক্ত মর্মনদের বিশাল গীর্জা দেখেছি অনেকবার। ইংল্যান্ডেও ওদের গীর্জা রয়েছে বলে শুনেছি। বর্তমানে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী Mary Osborne মর্মন—সম্প্রদায়ভূক্ত। ক্ষণিক পরিচয়ে মর্মন সম্প্রদায়ভুক্ত রুটকে আমার কাছে বেশ রসিক এবং প্রাণবন্ত মনে হয়েছিলো।

www.pathagar.com

মেরিল্যান্ড: আমেরিকা ইন মিনিয়েচার ?

ছুটির দিন বলে এতো সকালে ডিসি'-র রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা-ফাঁকা। এ্যাডাম অরগান থেকে বের হয়ে হাইওয়ে ২৭০ ধরতে তেমন কিছু সময় নিলো না দক্ষ ড্রাইভার কলিন। একটুখানি ডানে বাঁক নিয়ে ৬৬ ধরার একসিট। ৬৬ ধরেই একটানা ছুটে চলা। সাঁ-সাঁ গতিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসটি কখন-যে এসে পড়েছে রেস্ট এরিয়ায় তা টেরই পাইনি ইরিনের বক-বকানির চোটে। ডিসি থেকে সড়ক-পথে এদিক-সেদিক যাওয়ার পথে বেশ কয়েকবার বাল্টিমোরের বুক মাড়াতে হয়েছে। কিন্তু এবার আর উত্তরে নয়, যাত্রা সোজা পূর্বে। রেস্ট এরিয়ায় কয়েক মিনিটের বিশ্রাম, তারপর আবার দে-ছুট। শীত বিদায় নিয়েছে বেশ কিছুদিন। গাছের ডালে, পথে-প্রান্তরে আবার সবুজের সমারোহ। কাঁচের জানালায় সোনামাখা রোদ যেন চপলা কুমারীর রেশমী ওড়নার আলতো ছোঁয়া। ওর আদর-মাখানো পরশ পেয়ে প্রকৃতিও নিজের সৌন্দর্য মেলে ধরার জন্যে ব্যাকুল। মসৃণ রাজপথ যেন সবুজ ক্যানভাসের ওপর শিল্পাচার্যের তুলির কালো মোটা আঁচড়। সারা প্রকৃতি জুড়ে একটা মোহময় আবেশ, সান্নিধ্যে স্বর্ণকেশী সুন্দরী। এক-সময় কানে এসে বাজলো-

আকাশ আমায় ভরলো আলোয়,
আকাশ আমি ভরবো গানে।
সুরের আবীর হানবো হাওয়ায়
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।

ইরিনের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম।

: কি বলছো তুমি এসব।

: কবিতা।

: নিশ্চয়ই ট্যাগোরের?

: হ্যাঁ, কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?

www.pathagar.com

: ইথাকা থেকে নায়েগ্রা যাওয়ার পথেও তুমি আবৃত্তি করছিলে, জিজ্ঞেস করে জেনেছি ট্যাগোরের কবিতা। আচ্ছা, ট্যাগোরকে নিয়ে আমাদের হাঙ্গেরীতে-যে একটা জোক্‌স্ চালু আছে সেটা কি তোমাকে বলেছি কখনো?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৯ সালে হাঙ্গেরীতে গিয়েছেলিন জানি, বুদাপেষ্টে বসে 'লিখন' শেষ করেছিলেন শুনেছি, কিন্তু কোনো জোক্‌স্‌তো শুনিনি!

: হাঙ্গেরীতে মদ্যপান-প্রতিযোগিতার সময় একজন মাতাল হয়েছে-কি-হয়নি তা ঠিক করা হয় সে ট্যাগোরের পুরো নাম সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে-কি-পারছেনা তা বিবেচনা করে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে 'রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর'—এই কঠিন নামটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে যেতে পারবে ততোক্ষণ তাকে স্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা হবে, তার গ্লাসে ঢালা হতে থাকবে রক্তিম পানীয়।

কথা বলতে বলতে একসময় নদী-পার ৬৬ থেকে একসিট, তারপর স্থানীয় সড়ক ৫০ ধরে ছুটে-চলা। ব্রিজ পার হয়ে এক সময় গাঁয়ের সরুপথ ঝোপ-ঝাড়-লতাগুল্ম, পেরিয়ে কখনো বা কারো বাড়ির আঙিনায় যেন। কিন্তু, 'কে যায় আমার আঙিনা দিয়ে?' বলার কোনো জনমানবও চোখে পড়লো না সারা পথ জুড়ে। এক সময় আবার বড় সড়কে উঠে একটু মোড় কেটেই ছোট্ট শহর কেমব্রিজ।

International Student Service Council নামের ওয়াশিংটন ডিসি-ভিত্তিক এক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বের হয়েছি আজ। ডিসি-তে অবস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নানারূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কাজ। একাধিকবার আমন্ত্রণ পেয়েছি ওদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে। এ্যাপ্‌ল্ হার্ভেষ্টিং, মাউন্টেন হাইকিং, ইত্যাদি সব অনুষ্ঠানের কোনটাতেই যোগদান করা হয়নি ব্যস্ততার জন্যে। প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে হামফ্রে-ফেলো শফিক ভাই নর্থ ক্যারোলিনা থেকে ডিসি-তে এসে আমার এখানে উঠেছেন। তারই উৎসাহে এক ছুটির সকালে ওদের সঙ্গে যাত্রা করেছি মেরিল্যান্ডের চেসীপিক বে-এর উদ্দেশে। পথে কেমব্রিজ নামের ছোট্ট শহরটিতে কিছুক্ষণের বিরতি।

মেরিল্যান্ডবাসীদের মতে, এ রাজ্যটি হলো America in miniature অর্থাৎ আমেরিকার ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ-দাবি কতোটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়ে তর্ক হতে পারে, তবে পাহাড়, বনভূমি, নদী, সাগর—কি নেই ক্ষুদ্র এই রাজ্যটির। ডিসি-র গ্লোভার পার্কে থাকতাম, তাই ডান পা বাড়ালে ভার্জিনিয়া তো বাঁ পা বাড়ালে মেরিল্যান্ড। কতোদিন-যে রেডলাইন ধরে মেরিল্যান্ডের শেডিগ্রোভ থেকে ভার্জিনিয়ার হুইটন পর্যন্ত চষে ফেলতে হয়েছে নানা কাজে! পটোম্যাক নদীর তীরে মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়া থেকে মাত্র ৬০ বর্গমাইল জমি নিয়ে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ডিসি-র পাতাল মেট্রো সিস্টেম তার লাল, নীল, কমলা আর হলুদ লাইন দিয়ে রাজ্য দু'টিকে ডিসি-র সঙ্গে বেঁধে রেখেছে নানাভাবে। বাড়ীর কাছের টেনলিটাওনের রেড লাইন ধরে নিত্য উইক-এন্ডে

www.pathagar.com

গিয়ে নামতাম শেডিগ্রোভ। সেখান থেকে হালিম ভাই ও রুবী-ভাবী নিয়ে যেতেন তাঁদের গেইথেসবার্গ এর বাসায়। স্বল্প দূরত্বের এই পথটুকুর দু'ধারের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য বর্ণনা করা অসম্ভব, এক কথায় অপূর্ব। সহপাঠিনী জুলি-র বাসা, বিশ্ব ব্যাংকের ড. সৈয়দ মাহমুদ (আক্তার) কিম্বা আইএফএফ-এর ড. মোশারফ (মুনির)-এর বাথেসডার বাসায় গিয়েছি একাধিকবার। এগুলো সবই মেরিল্যান্ডের অংশ। চলার পথে কখনো মনে হয়নি রাজধানী ডিসি থেকে অন্য রাজ্য মেরিল্যান্ড। কিন্তু আজকের আসা একটু ব্যতিক্রমধর্মী, মেরিল্যান্ড দেখার জন্যেই যেন মেরিল্যান্ড আসা।

মেরিল্যান্ডে প্রথম ইউরোপীয় বসতি স্থাপিত হয়েছিলো ইংরেজ ক্যাথলিকদের দ্বারা ১৬৩৪ সালে। উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড বাল্টিমোর, যাঁর স্মরণে বাল্টিমোর শহরের নামকরণ করা হয়েছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে মেরিল্যান্ডের Antietam Creek জুড়ে। ঐতিহাসিক Annapolis-এর প্রতিটি প্রান্ত জুড়ে রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের নানারূপ স্মৃতি-সম্ভার। বাল্টিমোরে-এর ন্যাশনাল এ্যাক্যুরিয়ামের খ্যাতি রয়েছে জগৎ-জোড়া। কিন্তু ওসব কিছু নয়, আজ এসেছি মেরিল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অন্যতম, আকর্ষণীয় স্থান চেসীপিক বে দেখতে।

কেমব্রিজ শহরটি অত্যন্ত ছোট, নিরিবিলি আর একেবারেই শান্ত। যে-বাড়িটিতে এসে আমরা উঠলাম সেটা শহরের আবাসিক এলাকার এক প্রান্তে, একেবারেই লেকের ধারে। প্রচুরসংখ্যক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী জোগাড় করা হয়েছে গাইড হিসেবে। এক সময় মনে হলো অতিথির চাইতে গাইডের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী। আমার গাইড রোখসানা হেইলী, দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে। ওর মায়ের এক ইরানী বান্ধবীর নামানুসারে ওর নাম রাখা হয়েছে রোখসানা। মায়ের ওই বান্ধবীকে কখনো নিজ চোখে দেখেনি রোখসানা। কিন্তু মায়ের ঐ মৃতা বান্ধবীর প্রতি প্রচণ্ড রকম একটা দুর্বলতা রয়েছে এই কিশোরী মেয়েটির। অত্যন্ত উৎসাহভরে ও আমাকে হেঁটে হেঁটে এদিক-সেদিক দেখালো। লেকটিতে অসংখ্য স্পীডবোট, মনে হলো শহরের লোক সংখ্যার চাইতে স্পীডবোটের সংখ্যাই বেশী হবে। দেখার মতো তেমন কিছুই নেই, তবুও রোখসানাকে খুশি করার জন্যে হলেও একটু উৎসাহ দেখাতে হয়। এক সময় রওয়ানা হলাম মূল গন্তব্যস্থল চেসীপিক বে-এর উদ্দেশে। আবার গ্রামের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে প্রায় আধ ঘন্টার জার্নি। বে-এর তীর ঘেঁষে গড়ে-তোলা বিশাল বাড়িটিতে পৌঁছে যেন স্বস্তি পেলাম একটু।

কাঠের দেয়াল-ঘেরা বিরাট এলাকার মাঝখানে একটা মাঝারি আকৃতির বাংলো। বাংলোর সামনের দিকে দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশি। সমুদ্রের নীচ থেকেই এক ধরনের কাঠের খুঁটি ব্যবহার ক'রে বিশাল আকৃতির পাটাতন তৈরী করা হয়েছে। পাটাতনে বাঁধা একাধিক স্পীডবোট নিয়ে অনেকে মেতে উঠলো প্রতিযোগিতায়। কেউ বা স্কী-বব নিয়ে গভীর সমুদ্রে। নানা ধরনের খেলাধুলা, সাঁতার, ভুরিভোজের পর শেষ বিকেলে ফেরার পালা। গৃহস্বামী মি. বব সবার হাতে তুলে দিলেন তাঁর কোম্পানীর নামাঙ্কিত একটি করে

www.pathagar.com

প্লাস্টিক ফ্লাস্ক ও ফ্রিজবী। কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের জন্যে তৈরী একটা লিফলেট দিতেও ভুল করলেন না মি. বব। এদেশে 'ফ্রি লাঞ্চ' বলে কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজ পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করে সারাদিনের মেহমানদারীর বদলে কিছুটা আদায় করে নিলেন যেন তিনি। মনে পড়ছে প্রোগ্রামের প্রথম দিকে একবার কমিউনিটি ডিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলাম আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেগ রিভিল্‌স্-এর বাড়ী। সঙ্গে নেপালের গোপাল-প্রসাদ পোখরান। গ্রেগ অনেক বন্ধু-বান্ধবী জোগাড় করেছিলেন সেদিন আমদের সম্মানে। বয়সের সামঞ্জস্য থাকার করণে সেদিনের সন্ধ্যাটি উপভোগ্য হয়েছিলো নানাদিক থেকেই। কিন্তু ফেরার সময় গ্রেগ তাঁর কোম্পানীর উৎপাদিত কীটনাশকের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে কার্পণ্য করেননি আমদের কাছে। আসলে এদেশের অর্থনীতি বোধ হয় বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে। রেডিও, টিভিতে, বাসে-ট্রেনে, সংবাদপত্রে, রাস্তা-ঘাটে শুধু বিজ্ঞাপনেরই ছড়াছড়ি। কতো ধরনের-যে বিজ্ঞাপন! একদিন ওয়াশিংটন, ডিসি-র ইউনিয়ন স্টেশনের দোতলা দিয়ে হাঁটছি। একটা তৈরী-পোশাকের দোকানের সামনে দু'টি মডেল দাঁড়-করানো দেখলাম। সাথের নওশাদ বললো মেয়ে দু'টি জীবন্ত; কোনো স্ট্যাচু নয়। বলছো কি? বিশ্বাস হয় না। তাহলেতো আপনাকে প্রমাণ করে দেখাতে হয়। ও মেয়ে দু'টির সামনে গিয়ে নানারূপ অংগভংগি করে ভেংচি কাটা শুরু করলো। মেয়ে দু'টি কিছুক্ষণ পর একটু ঘুরে দাঁড়ালো সত্যি, কিন্তু ঠিক রোবটের ভংগিতে। আমি বললাম, ও দু'টি রোবট। নওশাদ বললো জীবন্ত মেয়ে। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টার পর নওশাদেরই জয় হলো। একটি মেয়ে হেসে ফেলে নওশাদকে অনুরোধ করলো ওখান থেকে সরে যাবার জন্যে।

কাগজের সারা-পৃষ্ঠা জুড়ে বিজ্ঞাপন: অমুক দোকানে 'সেল' (অর্থাৎ মুল্য-হ্রাস) চলছে। আপনি একশত ডলারের পণ্য পঁচাত্তর ডলারে কিনে নিয়ে পঁচিশ ডলার সেভ করতে পারেন। দলে-দলে ক্রেতা ছুটলো ওই দোকানের দিকে। হয়তো অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যটির জন্যে পঁচাত্তর ডলার খরচ করে ওরা পঁচিশ ডলার 'সেভ' করলো। এটাই হলো মার্কিনী বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর কেরামতি। আমার জনৈক অধ্যাপক একদিন ক্লাশে এই নিয়ে গল্প করছিলেন। তাঁর মা প্রতি সপ্তাহে নানারূপ অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনেন আর ছেলেমেয়েদের গল্প করে শোনান: এই সপ্তাহে তিনি কতো ডলার 'সেভ' করলেন। বাড়ির ভেতরেও বিজ্ঞাপনী সংস্থা কিম্বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হামলা লেগেই আছে। একজন মার্কিনীর প্রতিদিনকার দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে নিজ নিজ লেটার বক্স থেকে প্রচুর সংখ্যক বিজ্ঞাপনের কাগজ সংগ্রহ ক'রে তা ট্র্যাশ-ক্যান-এ ফেলা। কখনো-কখনো ওই-সব কাগজ থেকে কূপন কেটে নিয়ে নির্দিষ্ট দোকানে হাজির হলে কিছুটা ছাড় পাওয়া যায় বটে। বাই ওয়ান গেট টু ফ্রি—ধরনের বিজ্ঞাপনেরও অভাব নেই মল কিংবা রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে। একটা কিনে যদি দুটো মাগনা-ই পাওয়া যায়, তবে ওরা কি ধরনের ব্যবসা করে?

www.pathagar.com

রাস্তায় হাটার পথে কোনো দিন চোখে পড়েছে ফ্লি মার্কেট, গ্যারাজ সেল, ইয়ার্ড সেল, এস্টেট সেল কিম্বা মুভিং সেল-এর বিজ্ঞাপন। ফ্লি মার্কেট হচ্ছে খোলা আকাশের নীচে নুতন-পুরানো সব জিনিসপত্র বিক্রয়ের অস্থায়ী বাজার। সাধাণত শনি কিম্বা রবিবার কোনো একটা নির্দিষ্ট খোলা ময়দানে এই বাজার বসে। আপনার বাড়ির পুরনো আসবাবপত্র, তৈজসপত্র হয়তোবা বদলিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন, গ্যারাজ সেল কিম্বা ইয়ার্ড সেল বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দিলেন বাড়ির সামনের লনে। কিম্বা গ্যারাজের ভেতরে ঐ সব দ্রব্য সাজিয়ে রাখুন। স্বল্প মুল্যে ঐ সব জিনিস কেনার খদ্দেরের অভাব হবে না। বাড়ির সব-কিছু বিক্রি করে দিতে চান?—তো লাগিয়ে দিন না একটা 'মুভিং সেল' সাইন বোর্ড। ঠিকই খরিদ্দার এসে হাজির হবে। আর যদি স্থানীয় কোনো সংস্থা বা চার্চকে আপনার সব জিনিষপত্র দান করে দিয়ে যেতে চান, তবে ওদেরকে ডাকুন। ওরাই আপনার সব জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে পয়সা নিয়ে নেবে। আকাশে উড়োজাহাজ উড়ে ধোঁয়া দিয়ে লিখে দিচ্ছে কোনো কোম্পানী কিংবা কেনো দ্রব্যের নাম। কিম্বা বিশাল আকৃতির কোনো বেলুনে কোন পণ্য কিম্বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আকাশে। কখনো হয়তোবা কোকাকোলা-লেখা লাখ লাখ বেলুন উড়ছে আকাশ জুড়ে। একবার বাড়িতে বসে একটা বিজ্ঞাপন পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। একটা ছাপানো কাগজে আমার নাম লিখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছে। ... has won ten million dollar। বিষয়টা কি? সত্যি সত্যি দশ মিলিয়ন ডলার পেয়ে গেলাম নাকি? মাত্র কিছুদিন আগেইতো হামফ্রে-ফেলোদের লটারীতে একটা টিভি পেয়েছি। তাহলে আবারো লটারি পেলাম না-তো? কিন্তু লটারির কোনো টিকেট কিনেছি বলে-তো মনে পড়ছে না। তা হলে? বিষয়টা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা আছে সংযুক্ত কাগজে। একটা কোম্পানী তাদের Sweeptake লটারী পদ্ধতির মাধ্যমে ডিসি-তে বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে চারজনকে বাছাই করেছে প্রাথমিকভাবে। ওই চারজনের প্রথম ব্যক্তিটি হচ্ছি আমি। এখন সংযুক্ত কাগজে উল্লেখিত বিভিন্ন পত্রিকার তালিকা থেকে যে-কেনো একটি পত্রিকার গ্রাহক হতে হবে আমাকে। যদি গ্রাহক হই, তবে আমার গ্রাহক-নম্বর দিয়ে চারজনের মধ্যে আরো একটা লটারী হবে। ঐ লটারীতে জিতলে আমি হতে পারি দশ মিলিয়ন ডলারের মালিক। আমার জেতার সম্ভাবনা অন্তত পক্ষে পঁচিশ ভাগ। আমি পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলাম কি-না, দশ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিলাম কি-না, এসব উত্তর এখানে নাইবা দিলাম।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মিনেসোটায়: মিলন মেলায় বিদায়ী সিম্ফোনী

সময়ের যেন পাখা আছে, ফুড়ুৎ ক'রে ডানা মেলে আঙ্গিনায়-বসা চড়ুই পাখির মতো। বিরানব্বই-তিরানব্বই-এর ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো যেন ঝড়ের গতিতে উল্টালো। ঘরে ফেরার দিনকে এক সময় এনে দিলো হাতরে মুঠোয়। এক জুন থেকে অন্য জুন, মাঝখানে সেতু হয়ে রইলো হামফ্রে-ফেলোশীপের সুখ-দুঃখের ঘটনাবহুল বছরখানির স্মৃতি। ওয়াশিংটন ন্যাশনাল-এর লাউঞ্জে বসে নিজেদের তৈরী-করা "Good Governance or the Creation of Clones?"-এর পাতা উল্টাচ্ছিলাম সত্যি, কিন্তু সাত রাজ্যের স্মৃতি এসে ভিড় করছিলো। বারবার মনে হচ্ছিলো, কতো-কিছুই-না করার ছিলো, কতো-কথাই-না বলার ছিলো। কিন্তু সবই তো বাকি রয়ে গেল, সময় শুধু বয়ে গেল আপন গতিতে। সময় তার নগ্ন থাবা থেকে এখানেও রেহাই দিলো না আমাকে, কাউকেই ছাড় দেয় না সময়। ডেসিপেনু-র ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে ওর সঙ্গে ছুটতে হলো বোর্ডিং ব্রিজের দিকে। রোমানিয়ার এই মেয়েটি এমনিতে উচ্ছল প্রাণবন্ত, তবে কথায়-কথায় রাগ আর অভিমানে ভরপুর। এত অভিমান-ভরা মন নিয়ে ও বাড়ি থেকে এই ভিনদেশে বের হয়েছে কিভাবে তা ভেবে পাই না। পোল্যান্ডের মাইক তৃতীয়বারের মতো ওকে ইউরোপের ড্রাকুলা বলে ডেকেছে গতকাল। এই নিয়ে ওর অভিমানের শেষ নেই, হাজারটা অভিযোগ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা। গতরাতে টেলিফোনে আমাকেও খোঁচা দিতে কার্পণ্য করেনি ডেসিপেনু। রুমানিয়ার ড্রাকুলা যদি কেউ থেকে-থাকে তবে সে-ঐ নাদিয়া, মন্ট্রিল অলিম্পিকের পরে তোমারা যার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে পড়েছিলে বলে জানিয়েছো। 'সেতো কৈশোর পেরিয়ে সদ্য যৌবনে পা দেওয়ার কাল্পনিক রোমান্টিকতা'। কোনো যুক্তিই মনে ধরে না ডেসিপেন-র। আজ সকালেও ওর রাগ কমেনি মাইকের ওপর থেকে। এয়ারপোর্টে এসেও ওর সঙ্গে কথা নেই, বসেছে আমার সঙ্গে। অথচ জানি, একটু পরেই মেঘ কেটে যাবে, উজ্জ্বল সোনালী রোদে ঝলমল করবে ওদের মনের আকাশ, দুজনের বন্ধুত্বের উষ্ণতার ছোঁয়ায় আমাদের পরিবেশটাও হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত।

নর্থ-ওয়েস্ট এয়ার লাইন্স-এর ছোট্ট বোয়িং-টি নির্ধারিত সকাল দশটা পঁয়ত্রিশেই নামিয়ে দিলো মেনিয়াপোলিস টুইন সিটির দক্ষিণ-প্রান্তে। এখানকার মিনেসোটা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউবার্ট এইচ হামফ্রে ইনস্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত হবে হামফ্রে-ফেলোশীপ প্রোগ্রামের ছয়দিনব্যাপী সমাপ্তি-অনুষ্ঠান। হামফ্রে প্রোগামের শুরু ১৯৭৮ সনে, প্রয়াত ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটর হিউবার্ট হোরিশিও হামফ্রের স্মৃতির উদ্দেশে। বছরব্যাপী এই প্রোগ্রামের অর্থ যোগায় USIA-এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। Fulbright Exchange Program-এর অধীন হামফ্রে ফেলোশীপের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে Institute of International Educatoin (IIE) ১৯৭৮ সন থেকে শুরু ক'রে অদ্যাবধি প্রায় দুই হাজার বিশ্বনাগরিক এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে। এ দেশের প্রথম শ্রেণীর দশটি ক্যাম্পাসে ফেলোদেরকে ভাগ করে রাখা হয়। অন্ততপক্ষে দু'বার সকল হামফ্রে-ফেলোর একত্রিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, বছরের মাঝামাঝি ওয়াশিংটন ডিসি-তে, আর একবার সমাপ্তি-অনুষ্ঠানে, মিনেসোটায়।

হিউবার্ট হোরাশিও হামফ্রে জন্মেছিলেন ১৯১১ সনে, মিনেসোটার পার্শ্ববর্তী রাজ্য সাউথ ডেকোটার ওয়ালেস নামক স্থানে। পিতার ছিলো ঔষধের ব্যবসা, কিছুদিন কাজও করেছিলেন পিতার ব্যবসায়। পড়াশুনা করেছিলেন ফার্মেসী নিয়ে, প্রথমে লুইজিয়ানায়, পরে স্নাতক হয়েছিলেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রাজনীতিতে যোগদান ক'রে স্থানীয় ফার্মারস্ লেবার পার্টিকে একীভূত করেছিলেন জাতীয় পর্যায়ের ডেমোক্রেটিক পাটির সাথে। মিনিয়াপোলিসের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন দু'বার, ১৯৪৫ এবং ১৯৪৭-এ। ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৭০ পর্যন্ত প্রতিবারই মিনেসোটা থেকে সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৬৪-১৯৬৮ পর্যন্ত যুক্তরাষ্টের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপর ১৯৬৬ সনে এক মন্তব্য দিয়ে বিতর্কিতও হয়েছেন। ১৯৬৮ সনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর সঙ্গে অল্প ভোটের ব্যবধানে হেরেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ওপর বিতর্কিত মন্তব্য না-দিলে ফলাফল হয়তো-বা তাঁর পক্ষেও যেতে পারতো বলে অনেকেই মনে করেন। নির্বাচনে পরাজয়ের পর তিনি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন। ক্যান্সার-আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯৭৯ সনে মিনেসোটার ওয়েভার্লিতে মৃত্যুবরণ করেন।

সিভিল রাইট এ্যাক্ট, সমাজকল্যাণ লেজিসলেসন, নিউক্লিয়ার ব্যান ট্রিটি, বৃদ্ধদের জন্যে মেডিকেয়ার ইন্সিওরেন্স, শান্তির জন্যে খাদ্য, পিস কোর, ইত্যাদি বিষয়ের জন্যে হামফ্রে যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অর্থনীতিবিদ ও ভাষ্যকার রবার্ট ল্যাকাচম্যান হামফ্রেকে চিহ্নিত করেছেন "One of the most creative legislators in American history" হিসেবে। কিন্তু হামফ্রে পারদর্শিতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন বিষয় খুব কমই আছে। নরম্যান শেরম্যান যথার্থই বলেছেন। "It was hard to find something that did not excite his interest—from soybeans to space, from oceanography to vocational education" । ১৯৭৮ এ মৃত্যুবরণের পর হামফ্রের মরদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাখা হয়েছিলো ওয়াশিংটনের Capital Rotunda-তে। হামফ্রে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের দুইশত

www.pathagar.com

বছরের ইতিহাসে ২২তম ব্যাক্তি যিনি এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। এ-থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তাঁর অবস্থানের কথা অনুমান করা যায়। সিনেটর ফুলব্রাইট-এর পর হামফ্রেই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যাঁর নামে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেন। হামফ্রে ফেলোদের দেওয়া সম্মানের কথা বিবেচনা করেও তার মর্যাদার কথা অনুমান করা যায়।

মিনেসোটা রাজ্যটি এ্যাপালাশাইন পর্বতমালা পেরিয়ে এ-দেশের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে কানাডার সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত, রাজধানী ডিসি থেকে অনেক দূরে, একেবারেই যেন অন্য ভুবনে। এই অঞ্চলের প্রাণ যেন মিসিসিপি নদী, আর মিসিসিপি-র কথা মনে হলেই মনে পড়ে মার্ক টুয়াইন (প্রকৃত নাম স্যামুয়েল ক্লিমেন্স) আর তাঁর অমর উপন্যাস "The adventures of Huckleberry Finn"-এর কথা। মিনেসোটা এবং পশ্চিমের প্রতিবেশী সাউথ ও নর্থ-ডেকোটা রাজ্যগুলোর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক সময় বাস করতো সিয়ক্স গোষ্ঠীর ইন্ডিয়ানরা। তাই এ-অঞ্চল বিভিন্ন নামকরণের মধ্যে ওদের অতীত অস্তিত্বের কিছুটা ছোঁয়া পাওয়া যায়। মিনেসোটা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে একটি সিয়ক্স বাগধারা থেকে যার অর্থ Cloudy Water অর্থাৎ ঘোলা জল। সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে ১৯৯০তে ওদের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের মোট জনসংখার মাত্র ৩.৩ শতাংশে। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন এবং অন্যান্য উত্তর-ইউরোপীয়দের বংশধররাই আজকের এ-অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। এদেশের দ্বাদশ বৃহত্তম এ-রাজ্যটি ইউনিয়নে যোগদান করেছিলো ১৮৫৮ সনে।

প্রথম সন্ধ্যায়-ই রিসেপশন-প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুরু। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. জোশেফ এম. বার্গ-এর সঙ্গে পরিচয় হলো সেখানে। ড. বার্গ উপমহাদেশের ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ফারাক্কা-সমস্যাসহ অনেক বিষয়ের ওপর নিঃসঙ্কোচ মতামত দিয়ে ভদ্রলোক আমাকে বেশ অবাক করলেন। এক সময় বললেন মিনেসোটা হচ্ছে বাংলাদেশের ন্যায় জলাশয়ে-ভরপুর সমভূমি। প্রায় বিশ হাজার লেক ও জলাশয় রয়েছে রাজ্যটি জুড়ে। বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর পরিবর্তন ব্যাপক। এমনকি প্রতিদিনের আবহাওয়ার মধ্যেও তাপমাত্রার পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সুযোগ ক'রে নিয়ে মেনিয়াপোলিশ একটু ঘুরে দেখো, তোমার ভালো লাগতে পারে।

অধ্যাপক বার্গ-এর পরামর্শ স্মরণে রেখে ওয়ার্কসপ থেকে কিছুটা সময় চুরি ক'রে বের হই খালেদের সঙ্গে। খালেদ অর্থাৎ ড. শফি আহমেদ খালেদ এক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী-বন্ধু, বর্তমানে মেনিয়াপোলিসের একটা কলেজে অর্থনীতি পড়ায়। টেলিফোন পেয়ে স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে ও উপস্থিত আমার মেট্রোডোম-ইন হোটেলে। সেন্ট পল-এ ষ্টেট ক্যাপিটল, মেট্রোডোম, মিনেসোটা ক্যাম্পাস, ওর নিজের কলেজ, ইত্যাদি দেখিয়ে ও একসময় এনে দাঁড় করালো Minnehaha Falls-এর সামনে। কিন্তু নায়েগ্রা-দেখা চোখে কি মিনেহাহা জলপ্রপাতকে তেমন কিছু মনে হয়?

www.pathagar.com

পরদিন টুইন সিটি ট্যুর-এর ব্যবস্থা করেছে প্রোগ্রাম থেকেই। দক্ষ গাইডের প্রাণবন্ত উপস্থাপনা ট্যুরটিকে যেন আরো উপভোগ্য করে তোলে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মিনেয়াপেলিস অঞ্চলেও এক সময় বসবাস করতো সিয়ক্স গোষ্ঠীর ইণ্ডিয়ানরা। Franciscan Missionery Lewis Hennepin সর্বপ্রথম ১৬৮০ সনে এখানে পদার্পণ করেন, স্থানীয় জলপ্রপাতটির নাম করেন সেইন্ট এ্যান্থনী। ১৮১৯ সনে মিসিসিপি নদীর সংযোগ-স্থলে স্থাপন করা হয় ফোর্ড স্নেলিং দুর্গ। মিসিসিপির পশ্চিমে বৈধ ইউরোপীয় বসতি স্থাপন শুরু হয় ১৮৫৫ সনে। নদীর পূর্ব পার্শ্বে সেন্ট এ্যান্থনী কমিউনিটি স্থাপিত হয় ১৮৫৫ সনে যা-নাকি ১৮৬০ সন থেকে 'সেন্ট পল' শহরের গোড়াপত্তন করে। মিনেয়াপোলিস-এ গ্রাম স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সনে, শহরে রূপান্তরিত হয় ১৮৬৭ তে। ১৮৭২ সনে দু'টি শহর মিলিত হয়ে গঠিত হয় মিনেয়াপোলিস-সেন্টপল টুইন সিটি। সিয়ক্স শব্দ Minne অর্থ Water এবং গ্রীক শব্দ Polis অর্থ City থেকে Minneapolis শব্দটির উৎপত্তি। দু'টি শহরের বুক চিরে প্রবহমান নদী, শহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত খাল, জলাশয় আর জল-প্রপাতের উপস্থিতি প্রকৃত অর্থেই মেনিয়াপোলিসকে Water City অর্থাৎ জলের শহর বানিয়ে ফেলেছে।

সুন্দর একটা সন্ধ্যা কেটেছিলো শহরতলী মিনেটোকার হিডেনভ্যালী রোডের ডেভিড ও জোয়ানা-র গৃহে। স্থপতি ডেভিড একটা ব্যতিক্রমধর্মী নকশায় বাড়িটি তৈরী করেছে, যা সচরাচর দেখা যায় না, অন্তত আমি আর-কোথাও দেখিনি। একটা বিশাল আকৃতির ফুটবলের নীচদিকের কিছুটা অংশ কেটে যেন মাটির ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকটা অরল্যান্ডোর এপকোট সেন্টারের বিশাল গোলাকার টাওয়ারের মতো। ভেতরের দিকে কাঠের পাটাতনের দোতলা, ওপরে ওঠার জন্যে কাঠের পেঁচানো সিঁড়ি। দরজা জানালাগুলোও গোলাকার, মূলত এলুমিনিয়াম-ফ্রেমের ওপর নীলাভ কাঁচের টুকরো। বাইরে, প্রথমে জলের বেষ্টনী, তার বাইরে প্রাকৃতিক সবুজের মায়াবী পরশ। কমিউনিটি-ডিনারের সে-সন্ধায় প্রতিবেশী অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছিলো ডেভিড জোয়ানা। সব প্রতিবেশীই কিছু-না-কিছু খাবার রান্না করে নিয়ে এসেছে জোয়ানা-র পরিশ্রম, কিছুটা হলেও, লাঘব করার জন্যে।

আরেকটা সুন্দর বিকেল কেটেছিলো পার্শ্ববর্তী রাজ্য উইসকনসিনের Saint Croix Country-এর বোমাজ ফার্ম নামের খামারবাড়িতে। আমাদের দেশে যেমন নামবিহীন কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা করা যায় না, এদেশেও নাম-নেই-এরকম খামার খুঁজে পাওয়া ভার। কৃষি-অঞ্চলের রাস্তা দিয়ে চলার পথে কিছু দূরেই চোখে পড়বে সুন্দর সুন্দর খামারের সাইনবোর্ড। পেনসিলভেনিয়ার প্যারাডাইস কাউন্টির ভারডেন্ট ভিউ ফার্মের কথা মনে হচ্ছিলো বার-বার ক'রে। বোমাজ খামারের মালিক দুই ভাই গ্রেগ এবং বব। দু'ভাইয়ের নয় সন্তান। যৌথভাবে খামার চালায়, কিন্তু পাশাপাশি বসবাস করে দু'টো পৃথক গৃহে। বড়ো ভাই গ্রেগ, কথাবর্তায় অত্যন্ত সহজ-সরল, বার-বার ক'রে ওর স্থানীয়

www.pathagar.com

কৃষি-সমস্যার কথাই বলছিলো আমাদের কাছে। ছোট ভাই বব তুলনামূলকভাবে চটপটে, বিয়ে করেছে এক হিসপ্যানিক মেয়েকে। ববের বর্তমান পেশা ওর স্ত্রীর খুব-একটা পছন্দ নয়। একথা জানাতে কোনোরূপ দ্বিধা করলো না ওর হিসপ্যানিক স্ত্রী। বিদায়-পর্বে সবার হাতে কিছুটা ক'রে খামারের উৎপাদিত কর্ণ তুলে দিয়ে আপ্যায়নের চেষ্টা করলো কৃষক-পরিবারটি। উইসকনসিনের খামারবাড়ি থেকে যখন ফিরে আসছি তখন সন্ধ্যা আগত-প্রায়। গাড়ির জানালার কাঁচে বিদায়ী সূর্যের সোনালী চুম্বন। দু'দিকে অবারিত শস্যক্ষেত, কখনো বা ঢেউ খেলানো প্রান্তর, এক কথায় অপূর্ব। মনে পড়লো জাহের ভাই অর্থাৎ ড. নওয়াজেশ আহমেদ এক সময় চাচী-আম্মাকে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রচুর ভিউ-কার্ড পাঠাতেন। আমরা ছোটোরা সে-সব দৃশ্য দেখে বিমোহিত হতাম আর ভাবতাম, পৃথিবীতে সত্যিকারেই এতো সুন্দর কোনো দৃশ্য আছে!

খামারবাড়ী থেকে ফিরেই মেগা মলে। মিনেয়াপোলিসের অদূরে ব্লোমিংটনে তৈরী করা হয়েছে এদেশের সর্ববৃহৎ মল, পুঁজিবাদী অর্থনীতির এক বিরাট সাফল্য। ঐ বৎসরে মাত্র-চালু-করা মলটি তখনো ভালোভাবে জমে উঠেনি। কিন্তু কি নেই মলটিতে? মুভি হল, জিমনাশিয়াম, শিশুপার্ক থেকে শুরু ক'রে হাজারো পণ্যের হাজারো দোকান। সবগুলো দোকানে একবার ক'রে উঁকি মারতে গেলেই বোধহয় সারাদিন লেগে যাবে। করিডোর দিয়ে হাঁটার সময় গ্রীসের ডোরা বললো পৃথিবীতে যতো পণ্য-সম্ভার আছে, তার ক'টার কথাই বা আমরা জানি, আর তার ক'টাই বা মানুষের জীবন-যাপনের জন্যে অত্যাবশ্যকীয়? ডোরা মাঝে-মাঝেই দার্শনিকের মতো মন্তব্য করে অবাক করে দেয়।

সেমিনারের মূল থীম: Good Governance and Sustainable Development। দশটি ক্যাম্পাসের ফেলোরা দশটি প্রবন্ধ রচনা করেছে এই থীম নিয়ে। ওয়ার্কশপের সময় ফেলোদেরকে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপে ভাগ করা হলো আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার সুবিধার কথা বিবেচনা ক'রে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রুপে সার্কভূক্ত দেশগুলো। প্রায় সারাটা সময় জুড়েই বাকযুদ্ধ ক'রে চললাম আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে। মধ্যপ্রাচ্য গ্রুপে-তো প্রায় হাতাহাতি হবার অবস্থা। ইসরাইলের মুসলিম ফেলো কাশেমের অবস্থা দেখে করুণাই হচ্ছিলো অনেকের। কিন্তু আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার সাদামাটা অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপকে যেন একসূত্রে গেঁথে ফেললো। বিশেষ করে আরবী ভাষাভাষী দেশগুলোর ফেলোদের কান্ড দেখেতো আমরা অবাক। এমনকি ধার্মিকভাবে গোঁড়া ওয়ালিদকে-ও দেখলাম একসময় 'দফ' হাতে উঠে গেছে স্টেজে, লেবাননের খ্রিষ্টান মেয়ে মোনার হাত ধ'রে সে-কি উল্লাস-নৃত্য ওর। ভাষা মানুষকে কতো কাছে নিয়ে আসতে পারে! ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ডোবোরার নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের মেয়েগুলোর একটি সঙ্গীতের কথা এখনো কানে বাজে 'হোক-না কুৎসিত কিম্বা সুদর্শন, বেঁটে কিম্বা মোটা, একজন পুরুষ তো পুরুষই।' পুরুষ-শাসিত বর্তমান বিশ্বে নারী কি তার যোগ্য মর্যাদা কোনো সমাজেই পাচ্ছে না?

www.pathagar.com

শেষ-সন্ধায় প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের পক্ষ থেকে ইউএসআইএ-এর উপ-পরিচালক প্রেসিডেন্ট-স্বাক্ষরিত সনদপত্র তুলে দিলেন ফেলোদের হাতে। এ যেন মিলন-মেলায় বিদায়ী সিম্ফোনী। প্রায় সারারাত ধরেই চললো পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়ী শুভেচ্ছা-বিনিময়ের পালা। বছর ধরে গড়ে-ওঠা সহচরদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে এলো। এক সময় ছুটতে হলো নিজ কক্ষে, ভোর-বেলায়ই আমাকে ওয়াশিংটন ডিসি-'র ফ্লাইট ধরতে হবে। মাত্র দু'দিন সময় সবকিছু গুছিয়ে নেবার জন্যে। হৃদয়ের মাঝে বহন ক'রে যাওয়া বারো কোটি মানুষে ভারাক্রান্ত দুঃখিনী ভূ-খণ্ডটিতে ফিরে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে যেন। এখানকার বিত্ত-বৈভব, জৌলুস, সুখ স্বাচ্ছন্দময় জীবনের হাতছানি-এগুলোর সাধ্য কি সে-ব্যাকুলতাকে আটকে দেয়। এ-এক অন্যরকম অনুভূতি। কোনো শিল্পীর তুলি কিম্বা কবিতার পংক্তির উপমা দিয়েও তা প্রকাশ করা যাবে না। এ অনুভূতি নিজেই যেন নিজের উপমা।

www.pathagar.com

শেষ বিকেলে আবার দেখা

নর্থ-ওয়েস্ট এয়ারলাইন্স-এর ছোট্ট বোয়িং-টি আজ সকালেই ডিসি-'র ওয়াশিংটন ন্যাশনালে নামিয়ে দিয়েছে। সারাটি দিন গোছ-গাছ ক'রে কাটালেও বিকেল-বেলা ঘরে আবদ্ধ থাকতে আর ভালো লাগছিলো না। সামনের সবুজ চত্বরে পায়চারি করছিলাম। সন্ধ্যার পর ড. তারিক আসবে তুলে নিতে। শফিক ভাইকে নিয়ে ওর বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ। পাশের এপার্টমেন্টের মেডিক্যালের ছাত্রী হিদার 'হাই' বলে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেল সামনের দিকে। কাল চলে যাচ্ছি, অথচ ওর কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটাও হল না। মনটা নানা ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। হিদার-এর পিছু পিছু ফরটিয়েথ প্লেস পার হয়ে টানেল ধরে একসময় একেবারে উইসকনসিন এভিনিউর ওপর। চারদিকের পরিচিত পরিবেশকে কেন যেন আজ বড় আপন মনে হতে লাগলো। ডান দিকে বাঁক নিয়ে উইসকনসিন এভিনিউ ধরেই উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে চলি। একসময় বাংলাদেশ দূতাবাস ভবনটিকে বাঁয়ে রেখে আরেকটু এগিয়ে একেবারে সেফওয়ের কাছাকাছি প্রায়। পকেটে হাত দিয়ে সেফওয়ে ডিসকাউন্ট কার্ডটি সাথে রয়েছে কিনা তা অনুভব করতে চেষ্টা করলাম। ভাবনা, শেষ মুহূর্তে যদি পছন্দমতো কিছু পেয়ে যাই ওখানে। হঠাৎ সুরেলা কণ্ঠে 'হাই!' শব্দ শুনে পা দুটো আপনা-থেকেই আটকে গেল। অনেকটা ভূত দেখার মতই চমকে উঠলাম সামনে দাঁড়ানো ইভনিংকে দেখে। হ্যাঁ, ইভনিং-ইতো—মিস্টিক স্টেশনে নেমে-যাওয়া সেই অনন্যা মেয়েটি। কালো ট্রাউজারের সাথে টকটকে লাল টি-শার্ট পরেছে ইভনিং। হাতেও এক গুচ্ছ টকটকে লাল ফুল। চোখে-মুখে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ, পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আভা ওর মায়াবী বব্ড চুলের ওপর শেষ পরশ বুলিয়ে নিতে চায় যেন। 'হাই' বিনিময়ের পর ইভনিং-এর প্রথম প্রশ্ন—

: তুমি এখানে?

: আমারতো একই প্রশ্ন ইভনিং! কিন্তু তুমি আমাকে মনে রেখেছো দেখে বেশ অবাকই হচ্ছি।

: তুমি আমার নামটা পর্যন্ত মনে রেখেছো, আর আমি তোমার চেহারাটা মনে রাখতে পারবো না, তা ভাবলে কি ক'রে? তুমি তো সে-ই, যার সাথে বোস্টনের ট্রেনে মিস্টিসিজম

www.pathagar.com

নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো— আলোচনা হয়েছিলো বলা যায় না, বলা যায় আলোচনা শুরু হয়েছিলো।

: সারাদিন ট্রেনে পাশাপাশি থাকলেও তোমার সাথে কথা হয়েছে মাত্র কিছুক্ষণ। তা-ছাড়া তুমি আমার সাথে পরিচিত হতে খুব-একটা আগ্রহী ছিলে বলে মনে হয়নি আমার কাছে। আমি নিজ আগ্রহে তোমার নামটি জেনেছিলাম মাত্র, তুমি-তো আমার নাম পরিচয়ও জানতে চাওনি।

: তা তুমি ঠিকই বলেছো। আজকে তোমাকে পুনরায় দেখে মনে হলো আরেকবার কথা বলি। তুমি কি ডিসি-'তেই থাকো নাকি?

: থাকি ঠিক বলা যায় না, থাকতাম। এই গ্লোভার পার্কেই প্রায় এক বৎসর থাকলাম। আগামীকাল দেশে ফিরে যাবো। ভালোই হলো তোমার সাথে আরেকবার দেখা হয়ে।

আমার পরিচয় এবং এদেশে আসার উদ্দেশ্য ইত্যাদি-সব তথ্য এক-এক ক'রে জেনে নিল ইভনিং। আজকে ইভনিং-কে সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হলো। মনে হল, অনেক দিনের চেনা, অনেক বেশী আন্তরিক।আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে কাছে কোথাও একটু বসে কফি পানের আহ্বান জানালো ও। 'দেশে কফির ভক্ত হলেও চা-এর উৎপাদনকারী হিসেবে বিদেশে এসে আমি চা পান করি। তুমি কফির বদলে চা পান করলে তোমাকে কিছুটা সময় দিতে আপত্তি নেই'- বলে একটু রসিকতা করতে চেষ্টা করলাম। আমার উচ্ছাসের বিনিময়ে ইভনিং একটু হাসলো সত্যি, কিন্তু ওর এবারের হাসিটাকে বড়ই করুণ এবং ম্লান মনে হলো আমার কাছে। একটু হাঁটলেই জর্জ টাউনে রেষ্টুরেন্টের ছড়াছড়ি। কিন্তু হাতের কাছের একটা খোলা রেস্তোরায়ই বসে গেল ইভনিং। আমি ওকে অনুসরণ করলাম মাত্র। ইতোমধ্যে ওর মনের অবস্থা কিছুটা হলেও আঁচ করে ফেলেছি। ইভনিং-ও ততক্ষণে চায়ের অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস করার জন্যে আমি একটু সময় নিচ্ছিলাম। ইভনিং-ই আবার মুখ খুললো-

: জানো আমি কোথা থেকে এখন বের হলাম? একটা পামিস্ট-এর চেম্বার থেকে।

উইসকনসিন এভিনিউ-র এই এলাকায় কয়েকটি পামিস্ট-এর চেম্বার রয়েছে। রাস্তা থেকে ওদের নেম বোর্ড দেখে অবাক হয়েছি অনেকবার। সত্যি সত্যি এদেশে কেউ পয়সা খরচ ক'রে পামিস্ট-এর কাছে হাত দেখাতে যায়, তা এই প্রথম দেখলাম। আমার চোখে তখন জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

: আমার বয়ফ্রেন্ড ড্যাশ এই কাছের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওর মারাত্মক ধরনের একটা অসুখ হয়েছে। যাচ্ছিলাম ওকে দেখার জন্যে। বাস থেকে নামতেই পামিস্ট এর নেমপ্লেট দেখে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতেই পারছো।

: তা পামিস্ট কি বললো তোমার হাত দেখে? ড্যাশের অসুখটাই বা কি?

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়না ইভনিং। কিছুটা উদাস চোখে চেয়ে থাকে সামনের চলমান রাস্তার দিকে। 'ড্যাশকে নিয়ে বড় চিন্তায় আছি। ওর কিছু হলে আমি সহ্য করতে

www.pathagar.com

পারবো না'— কথাগুলো বলতে গিয়ে গলা ধ'রে আসে ইভনিং-এর। আমি কিছু বলে ওকে সান্ত্বনা কিম্বা মানসিক সাহস যোগানোর কথা ভাবি। কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে কিছু আর বলা হয়ে ওঠে না। আরো কিছু কথা বলে ইভনিং, ড্যাশ আর নিজেকে নিয়ে। একবার মনে হয়, ওর সাথে জর্জ টাউন হাসপাতালে গিয়ে ড্যাশ-কে দেখে আসি। পরমুহূর্তেই বাস্তবতায় ফিরে আসি। ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছে। শফিক ভাই নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারিকও হয়তো-বা একটু পরেই চলে আসবে। আমার যাবার কথা বলি ওকে। তারপর দু'জনেই একসাথে উঠে পড়ি। হাত বাড়িয়ে দেয় ইভনিং। আরো কিছুক্ষণ সৌজন্য বিনিময় হয়। "The Future's not ours to see" মৃদু স্বরে পর পর দু'বার বাক্যটি উচ্চারণ ক'রে, ইভনিং ওর পথে পা বাড়ায়।

ঘরে ফেরার সারাটা পথ জুড়েই যেন ইভনিং কথা কয়ে যায়। কানে বাজতে থাকে Ce Sera Sera, whatever will be will be। বার বার মনে হয় ইভনিং অদৃষ্টের প্রতি এতোটা বিশ্বাসী হয়ে পড়লো কেন? ওকে মানসিক সাহস যোগাতে না-পারার গ্লানিবোধ যেন আটকে ধরলো নিজেকে। পরদিন দেশে ফেরার আনন্দ-উচ্ছলতায় কিছুটা হলেও ভাঁটা পড়ে। এক সময় মনে হয় শেষ-বিকেলে ইভনিং-এর সাথে আবার দেখা না-হলেই বোধ হয় ভালো হতো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইউপিএল প্রকাশনা

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আমরা কি যাব না তাদের কাছে
যারা শুধু বাংলায় কথা বলে

জেমস জে নোভাক

বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব

আতাউস সামাদ

একালের বয়ান

হাসনাত আবদুল হাই

সোয়ালো

খুশবন্ত সিং

ট্রেন টু পাকিস্তান
আবু জাফর অনূদিত

আবদুন নূর

শূন্যবৃত্ত

জিয়া হায়দার

বিশ্বনাট্য
সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

সৈয়দ শামসুল হক

হৃৎকলমের টানে

আঁদ্রে মালরো

পাশ্চাত্যের প্রলোভন
আরশাদ-উজ জামান অনূদিত